কসদুস সাবীল

আল্লাহ প্রাপ্তির পথ

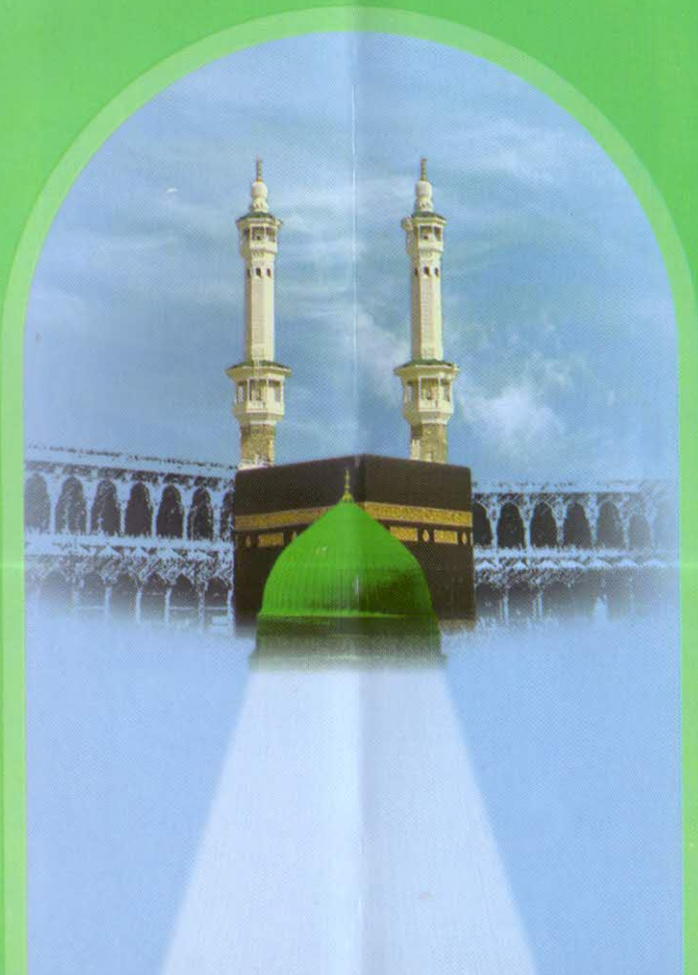

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

www.islamijindegi.com

আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ
কসদুস সাবীল

মূল
হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
মুহাদ্দিস : টঙ্গি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
মননশীল ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশক
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamijindegi.com

আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথ - কসদুস সাবীল

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মুমতায লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
মহররম ১৪৩০ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0009-4

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamijindegi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আল্লাহপাক মানুষকে দু'টি জিনিষের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি তার বাহ্যিক অবয়ব - অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ, শরীর। অপরটি হলো তার কলব বা আত্মা।

মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান যেমন আছে। [যেমন, ফযর, ওয়াজিব, সুনান ও মুস্তাহাব। এবং হারাম, মাকরূহ তাহরীমী, মাকরূহ তানযীহী।] তেমনিভাবে মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানও আছে এবং তার মধ্যে শারীরিক বিধানের মতোই ফরয, ওয়াজিব, সুনান ও মুস্তাহাব যেমন আছে, তেমনি হারাম, মাকরূহ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহীও আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজে আমরা যারা দীনদার বলে পরিচিত তাদের অধিকাংশের অবস্থাই হলো, আমরা শুধুমাত্র শারীরিক বিধান পালন করেই নিজেকে পরিপূর্ণ দীনদার মনে করে থাকি, অথচ আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধান মেনে চলার গুরুত্ব শারীরিক বিধানের চেয়েও বেশি। এর কারণ হলো, আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধান সম্পর্কে আমাদের অনেকের জানাই নেই অথবা জানা থাকলেও আমরা সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেই না। আসলে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় আত্মার গুরুত্ব অনেক বেশি। এ কথাটি একজন বুযুর্গ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এভাবে বুঝিয়েছেন যে, একজন মা'জুর মানুষ যার হাত কাটা, পা কাটা, দৃষ্টিশক্তি হীন-অন্ধ, শ্রবণ শক্তিও নেই-বধির, কিন্তু তার আত্মা-প্রাণশক্তি আছে। তাকেও মানুষ, মানুষ বলবে। কিন্তু অপর একজনের হাত, পা, চোখ, কানসহ বাহ্যিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কিন্তু তার শরীরে রূহ-আত্মা নেই, তাহলে এরূপ লোককে সবাই মৃত লাশ বলবে। মানুষ বলবে না। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা

www.islamijindegi.com

বুঝা গেলো যে, আত্মার গুরুত্ব শরীরের চেয়ে অনেক বেশি। একথাটিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন-

اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'নিশ্চয় মানবদেহে একটি গোস্তের টুকরো আছে, যখন সে টুকরোটি সুস্থ হয়ে যায়, তখন সমগ্র দেহ সুস্থ হয়ে যায়। আর যখন সেটা নষ্ট হয়ে যায়, বিগড়ে যায়, তখন সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, এটাই হলো কলব বা দিল।' (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং আত্মার রোগের চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ রাখলে সবকিছু ঠিক থাকবে, সুস্থ থাকবে। পক্ষান্তরে আত্মা যদি আধ্যাত্মিক রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উচিত আত্মাকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

'আল্লাহওয়ালা তথা আল্লাহর সত্যিকারের বান্দাদের সান্নিধ্যই মানুষকে পাপমুক্ত শুদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে। অতএব আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পথ হলো সত্যিকারের আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য। সত্যিকারের আল্লাহওয়ালার পরিচয় এবং তাঁর সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি হযরত থানভী রহ. এ কিতাবে বাতলে দিয়েছেন। হযরতের বাতলানো পদ্ধতির অনুসরণ করলেই যথাযথ উপকার লাভ করা যাবে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে, পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ তথা 'কলবে সালীম' নিয়ে তাঁর সমিপে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ ঃ

১২ মুহাররম ১৪৩০ হিজরী
১০ জানুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ঢাকা

www.islamijindegi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ

তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি

দ্বীনী শিক্ষার যে দিকটি 'তাসাওউফ' ও 'তরীকত' নামে পরিচিত, তা মূলত ইসলামী শরীয়তের নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যা ছাড়া ঈমান ও ইসলাম পরিপূর্ণ হতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল করারই অপর নাম 'তরীকত' ও 'তাসাওউফ'। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কিছুলোকের ইলমের কমতি ও গাফলতী এবং কিছু ভ্রান্তপন্থী লোকের অনধিকার চর্চার ফলে তাসাওউফের হাকীকত ও স্বরূপ এমন অস্পষ্ট ও ভেজালপূর্ণ হয়ে গেছে যে, কেউ দরবেশদের কিছু রীতি-প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের নাম তাসাওউফ রেখেছে। কেউবা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত উন্মাতাল অবস্থা ও অস্বাভাবিক ভাবকে তাসাওউফ বুঝেছে। কেউ কাশফ ও কারামতের নাম তাসাওউফ দিয়েছে। আর কিছু লোক ভুলবশতঃ কিছু বিদআতী কর্মকাণ্ডকে তরীকতের মধ্যে শামিল করে সেগুলোকেই তাসাওউফ ভাবছে।

এভাবে তাসাওউফের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই অধিকাংশ লোকের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গিয়েছে। মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের এই সংমিশ্রণের ফলে নানাবিধ ক্ষতি দেখা দিয়েছে। যেমন—যেসব লোক এখতিয়ার বহির্ভূত উন্মাতাল অবস্থা ও অস্বাভাবিক ভাবকে কিংবা কাশফ ও কারামতকে তাসাওউফ বুঝেছে—যেগুলো মূলত তাসাওউফের কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নয় এবং সবার হাসিলও হয় না এবং সেগুলো হাসিল না হলে ধর্মীয় পরিপূর্ণতায় কোন ত্রুটি বা তাসাওউফের মাকসাদের মধ্যে কোন কমতিও আসে না—এরূপ বুঝের অধিকারী আল্লাহর পথের পথিকগণ যখন মেহনত-মুজাহাদা করা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে এ ধরনের ভাব ও অবস্থা লাভ হতে দেখে না, তখন তাদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেয়। তারা ভাবে যে, আমাদের দ্বারা এ পথের সাফল্য লাভ করা অসম্ভব।

www.islamijindegi.com

অপরদিকে ত্রুটিপূর্ণ আমলের অধিকারী বরং ফাসিক–ফাজির লোকেরও কোন ওযীফা পাঠ বা আমলের মাধ্যমে এ ধরনের ভাব ও অবস্থা হাসিল হলে তারা একেই তাসাওউফের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য মনে করে অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যায়। তারা মনে করে যে, আমাদের এ পথের কামালিয়াত ও পূর্ণতা লাভ হয়েছে। অথচ শরীয়তের হুকুম–আহকাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুগামী হওয়া ছাড়া কারোই তাসাওউফের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য লাভ হতেই পারে না। এ ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের সমস্ত ইমামের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ যুগে সাইয়্যেদী হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুদ্দিসা সিররুহু)কে তাজদীদী খেদমত তথা সংস্কারমূলক কাজ এবং দ্বীনের ইসলাহী কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন। যার উপর তাঁর রচিত শত শত বই–পুস্তক সাক্ষী।

তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকত তথা স্বরূপকে সুস্পষ্ট করা, তার মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য করা এবং এ পথের সঠিক ও সফল আমলের পন্থাসমূহ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে হযরত থানভী (কুদ্দিসা সিররুহু) অনেক বই–পুস্তকই রচনা করেছেন। যেমন, 'আত্–তাকাশশুফ ফি মাসায়িলিত তাসাওউফ', 'মাসায়িলুস সুলূক', 'তা'লীমুদ্দীন' ইত্যাদি। পরবর্তীতে তাঁর এতদসংক্রান্ত সমস্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ এবং তরীকতের পথিকদের জন্য তাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক কর্মসূচী সম্বলিত 'কসদুস সাবীল' নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পরবর্তীতে তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করার জন্য এবং তাকে সহজবোধ্য করার জন্য মূল পুস্তিকার সঙ্গে পরিশিষ্টরূপে কয়েকটি প্রবন্ধও সংযুক্ত করেন। তিনি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ সমষ্টিকে 'খামসায়ে তাসাওউফ' এবং 'পাঞ্জ হাসসায়ে বাতিন' বা 'বাতেনী পঞ্চেন্দ্রীয়' নাম দিয়েছেন। ১৩৫০ হিজরী সনে এ পুস্তিকা প্রথম প্রকাশ পায়।

পুস্তিকাটি একাডেমিক ভাষায় লিখিত ছিলো বিধায় কম শিক্ষিত লোকদের জন্য তা থেকে জ্ঞান আহরণে জটিলতা দেখা দিতো। তাই হযরত হাকীমুল উম্মত (কুদ্দিসা সিররুহু)–এর প্রধান খলীফা, কাশফ ও

www.islamijindegi.com

কারামতের অধিকারী বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ লুতফে রাসূল সাহেব হযরতের অনুমতিক্রমে সহজবোধ্য ভাষায় পুস্তিকাটির সহজিকরণ করেন। 'তাসহীলে কসদুস সাবীল' নামে তা বহুবার প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকার সঙ্গে পরিশিষ্টাকারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ইলমের স্বল্পতা এবং মানুষের আরামপ্রিয়তা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, মানুষ একটি পুস্তিকা পাঠ করে তারপর তার পরিশিষ্টসমূহ পৃথকভাবে অধ্যয়ন করে সবকিছুর সমষ্টি থেকে ফলাফল বের করবে, তা খুবই জটিল হয়ে গেছে। ফলে এ শ্রেণীর মানুষ বুযুর্গদের ইলমী হীরকখণ্ডসমূহকে পাঠ করাই কমিয়ে দিয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা অধমের দৃষ্টিতে তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকতকে সুস্পষ্ট করা, তার মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য করা এবং আধ্যাত্মিকতার এ পন্থাকে সহজিকরণের ক্ষেত্রে সাগরকে কলসে ভরার নামান্তর। যার মধ্যে এ পথের প্রাথমিক স্তরের লোকদের থেকে সর্বশেষ স্তরের লোকদের পর্যন্ত সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েতসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এ অধম বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের সুবিধার্থে এ পুস্তিকার বিষয়বস্তুসমূহের সারসংক্ষেপ এমনভাবে লিপিবদ্ধ করার জরুরত উপলব্ধি করি, যার মধ্যে পরিশিষ্টের বিষয়সমূহকে মূল বক্তব্যের সাথে একীভূত করে লেখা হবে। এবং মূল পুস্তিকার যেখানে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা আছে, তার ব্যাখ্যা করা হবে।

তাই বর্তমান পুস্তিকায় প্রথম পাঁচ 'হেদায়াত' পর্যন্ত কিছু ব্যাখ্যাও সংযোজিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ 'হেদায়াত' থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত 'তাসহীলে কসদুস সাবীলের' প্রায় পুরো বিষয়বস্তুই এ পুস্তিকার মূল মাকসাদ। কসদুস সাবীলের এ সারসংক্ষেপ লিখিত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের জন্য। এটি অধ্যয়ন করার দ্বারা বিষয়বস্তুর সাথে কিছুটা মোনাসেবাত (পরিচিত ও সম্পর্ক) পয়দা হলে মূল 'কসদুস সাবীল' অধ্যয়ন করাও নেহায়েত উপকারী হবে। কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁরই উপর ভরসা পোষণ করি।

বান্দাহ **মুহাম্মাদ শফী'** আফাল্লাহু আনহু
৫ জুমাদাল উলা, ১৩৯৪ হিজরী

www.islamijindegi.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَالْمَوْلَى الْجَلِيْلُ وَ عَلَيْهِ مُنْتَهٰى قَصْدِ السَّبِيْلِ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهٗ فِى الْكَمَالِ عَدِيْلٌ. وَهُوَ لِذٰلِكَ السَّبِيْلِ خَيْرُ دَلِيْلٍ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْبَاذِلِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِى اللّٰهِ مِنْ كُلِّ كَثِيْرٍ وَ قَلِيْلٍ. اَلْمُبَلِّغِيْنَ لِلْاٰيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَ ذُلِّ ذَلِيْلٍ.

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান মাওলা এবং তাঁরই নিকট সোজা পথের সমাপ্তি। আমাদের সরদার মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক, পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আর তিনি হলেন সেই সোজাপথের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁরা আল্লাহর পথে অল্পবিস্তর জানমাল ব্যয়কারী এবং যাঁরা সম্মানিতদের সম্মান এবং অপমানিতদের অপমানের সাথে আয়াত ও হাদীসসমূহের তাবলীগকারী।

মূলত শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল করারই অপর নাম 'তাসাওউফ' ও 'তরীকত'। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে এমনই এক অস্পষ্টতা ও অবিমিশ্রণ হয়ে আসছে যে, অনেক অজ্ঞ লোক কিছু কিছু বুযুর্গের রসম ও আচার-অনুষ্ঠানকে এবং অনেক লোক তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত অস্বাভাবিক ভাব ও উন্মাতাল অবস্থাকেই তাসাওউফ বুঝেছে। তাসাওউফের মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য না থাকার ফলে কিছু লোক তাসাওউফকে অত্যন্ত জটিল এবং এর উপর আমল করা অসম্ভব মনে করে হতাশ হয়েছে। আর কিছু লোক শরীয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকা এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র শরীয়তবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিছু ভাবের উদ্রেক হওয়া এবং কিছু ভালো স্বপ্ন দেখার ফলে নিজের নফসের ইসলাহ এবং শরীয়তের উপর আমল করার প্রতি

www.islamijindegi.com

গুরুত্ব না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। এ সমস্ত খারাপ দিকের সংশোধনের উদ্দেশ্য তরীকত ও তাসাওউফের হাকীকত এবং তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সে লক্ষ্য–উদ্দেশ্য হাসেল করার পন্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কিছু বিষয় 'হেদায়াত' শিরোনামে এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করছি।

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম হেদায়াত : শরীয়ত ও তরীকতের বয়ান	১১
দ্বিতীয় হেদায়াত : তাওবার বয়ান	১৫
তাওবার হাকীকত ও তার তরীকা	১৫
ওয়াজিব হকসমূহ পরিশোধ করা	১৭
তৃতীয় হেদায়াত : ইলমে দ্বীন অর্জন করা	২০
চতুর্থ হেদায়াত : পীরের প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিচয়	২১
কামেল পীরের পরিচয়	২১
পঞ্চম হেদায়াত : পীর-মুরীদীর উদ্দেশ্য	২৩
বাইয়াত ও পীর-মুরীদীর হাকীকত	২৭
ষষ্ঠ হেদায়াত : মুরীদদের জন্য আমলপঞ্জি	২৮
মৃত্যুর মোরাকাবা	৩৬
বাতেনী নিসবত	৪০
সপ্তম হেদায়াত : মনের একাগ্রতা সৃষ্টির বর্ণনা	৪৫
অষ্টম হেদায়াত : এখতিয়ারী ও গায়রে এখতিয়ারী আমলের বর্ণনা	৪৭
নবম হেদায়াত : পীরদের বিভিন্ন প্রথার বর্ণনা	৫০
দশম হেদায়াত : সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে নসীহত	৫২

www.islamijindegi.com

প্রথম হেদায়াত

শরীয়ত ও তরীকতের বয়ান

'সুলূক' ও 'তরীকত'—যাকে মানুষ 'তাসাওউফ' বলে থাকে—তার হাকীকত বা মূল কথা এই যে, মুসলমান তার যাহের ও বাতেন তথা ভেতর ও বাহিরকে নেক আমল দ্বারা সজ্জিত করবে এবং বদআমল থেকে দূরে রাখবে। এর বিশ্লেষণ এই যে—

মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভের উপায় হলো, শরীয়তের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা। শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানের মধ্যে কিছু রয়েছে মানুষের বাহ্যিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। আরো রয়েছে বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর হক আদায় করা, কসম (শপথ) এবং কসমের কাফফারা ইত্যাদি। আরো রয়েছে লেনদেন, মোকদ্দমা পরিচালনা, সাক্ষ্যদান, ওসীয়্যত, উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন ইত্যাদি। আরো রয়েছে সালাম-কালাম, খাওয়া-শোয়া, ওঠা-বসা, মেহমানী- মেযবানী ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী। উপরোক্ত সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত মাসআলাসমূহকে 'ইলমে ফিকহ' বলে।

আর কিছু রয়েছে মানুষের অভ্যন্তর তথা অন্তর বিষয়ক বিধান। যেমন—আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁকে স্মরণ করা, দুনিয়াকে কম ভালোবাসা, আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, ইবাদতের সময় অন্তরকে হাযির রাখা, আল্লাহর কাজকে ইখলাসের সাথে আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্য করা, কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত না হওয়া, রাগ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। এ সমস্ত স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলীকে 'সুলূক', 'তরীকত' ও 'তাসাওউফ' বলে।

www.islamijindegi.com

শরীয়তের বাহ্যিক বিধানাবলী—নামায, রোযা ইত্যাদির উপর আমল করা যেমন ফরয–ওয়াজিব, তেমনিভাবে এ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিধানাসমূহের উপর আমল করাও কুরআন ও সুন্নাহের দৃষ্টিতে ফরয–ওয়াজিব। তাছাড়া বাতেনী মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে দূরে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এজন্য অধিক জরুরী যে, এ সমস্ত বাতেনী মন্দ চরিত্রের কুপ্রভাব বাহ্যিক আমলসমূহের উপরও পড়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত কম হওয়ার ফলে নামাযের মধ্যে অলসতা দেখা দিলো বা রুকু–সেজদার হক আদায় না করে দ্রুত পড়ে ফেললো, বা কৃপণতার ফলে যাকাত প্রদানের বা হজ্জ আদায় করার সাহস হলো না, বা অহংকার কিংবা রাগের প্রাবল্যের কারণে কারো উপর জুলুম হয়ে গেলো। সারকথা হলো, শরীয়ত ও তরীকত দু'টি পৃথক জিনিস নয়। শরীয়তের জাহেরী ও বাতেনী সমস্ত হুকুমের উপর পরিপূর্ণ আমল করার নামই 'তরীকত'। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) ইলমে ফিকহের সংজ্ঞাই এমনভাবে দিয়েছেন যে, সংজ্ঞায় জাহেরী আমল ও বাতেনী আমল সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালের আলেমগণ ইলম হাসিলের সুবিধার্থে জাহেরী আমলসমূহ যথা—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, ব্যবসা, ভাড়া চুক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকে পৃথকভাবে সংকলিত করে তার নাম দিয়েছেন—ইলমে ফিকহ। আর বাতেনী আমলসমূহ যথা—ইখলাস, সবর, শোকর, যুহদ ইত্যাদি আমলসমূহের বিধি–বিধানকে পৃথকভাবে সংকলিত করে তার নাম রেখেছেন—তাসাওউফ ও তরীকত। এ পরিভাষা অনুপাতে শরীয়ত ও তরীকতের একটিকে অপরটি থেকে এভাবে পৃথকও বলা যেতে পারে, যেমন কিনা নামায একটি পৃথক ইবাদত এবং রোযা একটি পৃথক ইবাদত। এবং যেমন কিনা মানুষের হাত একটি পৃথক অঙ্গ এবং পা একটি পৃথক অঙ্গ। চোখ এক জিনিস আর কান অন্য জিনিস। অন্তর, কলিজা ও ঠোঁট পৃথক পৃথক অঙ্গ। কিন্তু একটি মানবের পূর্ণতা এসবগুলোর সমন্বিত রূপেই হয়ে থাকে। এগুলোর একটিকে নিয়ে অপরটি বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

এমনিভাবে পরবর্তীকালের আলেমগণের পরিভাষামতে ইলমে

www.islamijindegi.com

আকায়িদ, ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাওউফ নিঃসন্দেহে পৃথক পৃথক বিষয় ও শাস্ত্র, কিন্তু সঠিক ও পরিপূর্ণ মানুষ বা মুমিন ও মুসলমান এ সবকিছুর সমন্বয়েই হয়ে থাকে। এবং কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসরণ এর সবগুলোর উপর আমল করার দ্বারাই লাভ হতে পারে। এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে নিয়ে অন্যগুলোকে এড়িয়ে চলা এমনই ধ্বংসাত্মক, যেমন ধ্বংসাত্মক কানের হেফাযত করে চোখ নষ্ট করা। বা রোযার হেফাযত করে নামায নষ্ট করা।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন—

'তরীকতহীন শরীয়ত নিরেট দর্শন, আর শরীয়তহীন তরীকত ধর্মহীনতা।'

হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী (রহঃ) ফরমায়েছেন—

'যে ব্যক্তির যাহের পাক নয়, তার বাতেন পাক হতেই পারে না।'

যাহের পাক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাহেরী আমলসমূহের পাবন্দী করা, যেগুলো ইলমে ফিকহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়। আর বাতেন পাক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাতেনী আমলসমূহের পাবন্দী করা, যেগুলো বর্ণনা করা হয় ইলমে তাসাওউফ ও সুলূকের মধ্যে।

ইমাম সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' কিতাবে সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে সমস্ত অস্বাভাবিক ভাব ও অবস্থা দেখা দেয়, সেগুলো সম্পর্কে বলেন যে, হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ বলেছেন—

كُلُّ وَجْدٍ لَا يَشْهَدُ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَبَاطِلٌ

'যেই উন্মাতাল অবস্থার কোন সাক্ষ্য কুরআন–সুন্নায় মওজুদ নেই, তা বাতেল।'

তারপর তিনি বলেন যে, সুফিয়ায়ে কেরামের ইত্তিবায়ে সুন্নাতের অবস্থা এই, তাই যে জাহেল বা মূর্খ সূফী এর বিপরীত হালতের দাবীদার হবে, সে ফেতনায় নিপতিত, ডাহা মিথ্যুক।

(আওয়ারিফ, ইহয়াউল উলূমের টীকায় উদ্ধৃত খণ্ড–১, পৃঃ ২৮০)

www.islamijindegi.com

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মশহুর ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী (রহঃ) সে যুগের সুফিয়ায়ে কেরামের নামে 'রিসালায়ে কুশাইরিয়া' নামে যে পয়গাম লিখেছিলেন—তার মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতকেই সমস্ত সুফীর প্রকৃত কর্তব্য আখ্যা দিয়েছেন।

এ থেকে জানা গেলো যে, তাসাওউফের কতক মূর্খ দাবীদার যে বলে, শরীয়ত ও তরীকত দু'টি পৃথক রাস্তা। যে কাজ শরীয়তে হারাম তা তরীকতের মধ্যে হালাল হতে পারে। এটি নিশ্চিত ভ্রষ্টতা, সুস্পষ্ট ধর্মহীনতা এবং সমস্ত সুফিয়ায়ে কেরামের মত ও পথের পরিপন্থী কথা।

www.islamijindegi.com

দ্বিতীয় হেদায়াত
তাওবার বয়ান

প্রথম হেদায়াতের আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকত তথা প্রকৃত স্বরূপ এটাই যে, শরীয়তের যাহেরী ও বাতেনী সমস্ত বিধানের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে হবে। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শরীয়তের সমস্ত বিধানের উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয, ওয়াজিব ও জরুরী। তাই এ ব্যাপারে কোনরূপ গাফলতী বা শৈথিল্য প্রদর্শন না করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আরো কর্তব্য এই সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া।

যে ব্যক্তি এ পথে চলার সংকল্প করবে, তার সর্বপ্রথম কাজ হলো, অতীতে কৃত সমস্ত গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে তাওবা করা। তাওবা করার তরীকা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, তাওবার জন্য আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত হক আদায় করা হয়নি, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো আদায়যোগ্য, সেগুলো আদায় করতে হবে। বিশেষ করে বান্দার যে সমস্ত হক নিজ দায়িত্বে রয়েছে—তা আর্থিক হক হোক, যেমন, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, বা শরীরিক হক হোক, যেমন, কাউকে হাত বা মুখ দ্বারা কষ্ট দিয়েছে—এ সমস্ত হক পরিশোধ করা বা পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ নিয়ে নেওয়া তাওবার জন্য শর্ত। যে পর্যন্ত কোন মানুষ এ সমস্ত হক থেকে মুক্তি লাভ না করবে, সে যদি সারাজীবনও ইবাদত–বন্দেগীতে কষ্ট–সাধনা করতে থাকে তবুও কস্মিনকালেও আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

তাওবার হাকীকত ও তার তরীকা ঃ

শুধু মুখে 'তাওবা' 'তাওবা' বলার দ্বারা বা ইস্তিগফারের শব্দ উচ্চারণ করার দ্বারা তাওবা হয় না। বরং প্রকৃত তাওবা হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক বিষয় থাকা জরুরী।

www.islamijindegi.com

এক. অতীতে কৃত গুনাহসমূহের উপর অনুশোচনা ও আক্ষেপ এবং অন্তরে ব্যথা, বেদনা ও জ্বালা সৃষ্টি হতে হবে।

দুই. তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে।

তিন. অন্তরে পাকাপোক্ত সংকল্প করতে হবে যে, ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত গুনাহের কোন একটির কাছেও যাবো না।

তাওবার প্রথম মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ, অতীতে কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জা, অনুশোচনা এবং অন্তরে ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য এ বিষয়ের সঠিক ইলম অর্জন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। প্রথমতঃ মানুষের এ কথা জানা থাকতে হবে যে, কোন্ কোন্ কাজ কবীরা বা সগীরা গুনাহ। দ্বিতীয়তঃ একথা জানা থাকতে হবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে এ সমস্ত গুনাহের কারণে কি কি বিপদ-মুসীবত আসে। এ সমস্ত বিষয় এ অধমের লিখিত 'গুনাহে বেলযযত' পুস্তিকা থেকেও জানা সম্ভব। এবং বুযুর্গদের অন্যান্য কিতাব থেকেও এগুলো জানা সম্ভব। যেমন, বেহেশতী যেওর, জাযাউল আ'মাল, তা'লীমুদ্দীন, হায়াতুল মুসলিমীন, তাবলীগে দ্বীন ইত্যাদি। এ সমস্ত কিতাব নিয়মিত অধ্যয়ন করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ অন্তরে নিজের গুনাহসমূহের উপর লজ্জা-অনুশোচনা এবং ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি হবে।

তাওবার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়, সমস্ত গুনাহের কাজকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করা। এ কাজ হিম্মত করা ছাড়া সম্ভব নয়। আর এই হিম্মত করার তরীকা বুযুর্গ ও নেক লোকদের সাহচর্য গ্রহণ এবং তাদের জীবনী ও ঘটনাবলী পাঠ করা ও শ্রবণ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাওবার তৃতীয় মৌলিক বিষয়, ভবিষ্যতের জন্য গুনাহের কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। আর এ কাজটি মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ যে কোন সময় ইচ্ছা করলে এটা করতে পারে।

সব কাজেই যেমন হিম্মত করা জরুরী, তেমনি এ ব্যাপারেও দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন, জানমালের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, দুনিয়ার যত স্বার্থই হাতছাড়া হোক না কেন এবং যত মানুষই তিরস্কার করুক না কেন—সব সহ্য করবো, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করা

www.islamijindegi.com

ছাড়বো না। এতটুকু সাহস যদি না থাকে তাহলে বাস্তবে সে আল্লাহকে পেতে চায় না।

ওয়াজিব হকসমূহ পরিশোধ করা ঃ

উপরোল্লেখিত কিতাবসমূহে যখন আপনি গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ দেখবেন, তখন জানতে পারবেন যে, এ সমস্ত গুনাহের মধ্যে কিছু গুনাহ তো এমন রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করা হয়েছে। কোন মানুষ এর দ্বারা কোন কষ্ট পায়নি। আর কিছু গুনাহ রয়েছে এমন, যার দ্বারা অন্য কোন একজন মানুষ বা অনেক মানুষ কষ্ট পেয়েছে। প্রথম প্রকারের হককে 'হুকূকুল্লাহ' বা আল্লাহর হক বলে। আর দ্বিতীয় প্রকারের হককে 'হুকূকুল ইবাদ' বা বান্দার হক বলে।

আল্লাহর হকের মধ্যে কিছু হক রয়েছে এমন, যেগুলোর 'কাযা' করা বা কাফফারা দেওয়া সম্ভব। যেমন নামায বা রোযা ছুটে গিয়ে থাকলে সেগুলোর 'কাযা' করা ওয়াজিব। বা বিগত সময়ে যাকাত না দিয়ে থাকলে এখন তা প্রদান করা জরুরী। এমনিভাবে হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন হজ্জ করতে হবে। বা শপথ করে তা ভাঙ্গা সত্ত্বেও তার কাফফারা প্রদান না করে থাকলে তা প্রদান করা জরুরী।

আল্লাহর হকের দ্বিতীয় প্রকার এমন, যেগুলোর শরীয়তে কোন কাফফারা নির্ধারিত নেই। যেমন মিথ্যা বলা বা কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে শরীয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহের তাওবা শুধুমাত্র এই যে, কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের গুনাহের ক্ষমা ভিক্ষা চাবে এবং সবসময় ইস্তিগফার করতে থাকবে।

আল্লাহর হকের প্রথম প্রকার—যেগুলোর কাযা বা কাফফারা শরীয়তে নির্ধারিত আছে—সে সমস্ত হক 'কাযা' বা 'কাফফারা'র মাধ্যমে পরিশোধ করা আবশ্যক। যেমন ভালোভাবে চিন্তা করে হিসাব করবে যে, সারাজীবনে কতগুলো নামায ছুটে গেছে। কতগুলো রোযা রাখেনি, এখন তার সবগুলো 'কাযা' করবে। যদি ছুটে যাওয়া নামায পরিমাণে বেশী হয়, তাহলে শক্তি-সাহস ও সময়-সুযোগ মত কিছু কিছু করে কাযা

www.islamijindegi.com

করতে আরম্ভ করবে। ছুটে যাওয়া নামাযের সবগুলো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এভাবে আদায় করতে থাকবে। এমনিভাবে অতীতে সম্পদের যাকাত না দিয়ে থাকলে অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে সম্ভব হলে পুরোটা একবারে, না হয় অল্প অল্প করে তা পরিশোধ করতে থাকবে।

একইভাবে সদকায়ে ফিতর বা কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো না দিয়ে থাকলে এখন তা দেওয়া এবং কুরবানীর মূল্য দান করা জরুরী, তাই তা দান করবে। এমনিভাবে কসম (শপথ) ভেঙ্গে থাকলে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। তাও আদায় করবে। কেউ রোযা রেখে স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে থাকলে তার কাফফারা ওয়াজিব, তাই তার কাফফারাও আদায় করবে।

এভাবে আল্লাহর হকসমূহের মধ্য থেকে যে সমস্ত হকের 'কাযা' করা সম্ভব সেগুলোর 'কাযা' করবে এবং যেগুলোর 'কাফফারা' দেওয়া সম্ভব সেগুলোর 'কাফফারা' আদায় করবে। এ ধরনের ছুটে যাওয়া সমস্ত ইবাদতের 'কাযা' ও 'কাফফারা' থেকে মুক্ত না হলে নিছক মৌখিক তাওবা মোটেই যথেষ্ট নয়।

বান্দার হক ঃ

দ্বিতীয় প্রকারের হক, বান্দার হক। বান্দার হকও দুই প্রকার। প্রথম প্রকার আর্থিক হক। যেমন, কারো থেকে ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ করেনি। বা কোন চুক্তি বা লেনদেনের কারণে কারো কোন অর্থসম্পদ তার দায়িত্বে ছিলো, যা সে পরিশোধ করেনি। বা কারো সম্পদ অবৈধভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে, আত্মসাৎ করেছে বা কারো থেকে ঘুষ নিয়েছে। এ জাতীয় সমস্ত হকেরও তালিকা তৈরী করে সবগুলো পরিশোধ করবে। এক সঙ্গে সব পরিশোধ করতে না পারলে নিজের সামর্থ্য মত পরিশোধ করতে আরম্ভ করবে। এ সমস্ত হকের পাওনাদার যারা, তারা জীবিত থাকলে এবং তাদের ঠিকানা জানা থাকলে তো এগুলো পরিশোধ করা সহজ। তারা মরে গিয়ে থাকলে তাদের ওয়ারিসদেরকে তালাশ করে তাদের হক পরিশোধ করা জরুরী। খোঁজ

www.islamijindegi.com

করা সত্ত্বেও তাদের ঠিকানা জানা না গেলে তাদের প্রাপ্য পরিমাণ অর্থ তাদের তরফ থেকে দান করে দিবে।

বান্দার হকের দ্বিতীয় প্রকার হলো, শারীরিক হক। যেমন কাউকে হাত বা জিহ্বা দ্বারা শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কষ্ট দিয়েছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, তাহলে তার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া জরুরী। কাউকে মারপিট করে থাকলে তাকে বদলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে বলবে যে, তোমার ইচ্ছা, আমাকে মেরে প্রতিশোধও নিতে পারো বা মাফও করে দিতে পারো।

উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ মোতাবেক বান্দার যাবতীয় আর্থিক ও শারীরিক হক থেকে মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তাওবা পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর তাওবা পরিপূর্ণ হওয়া ছাড়া নফল ইবাদত ও যিকির-শোগলের মধ্যে জীবনভর যতই মেহনত করুক না কেন, কখনই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না এবং সঠিক পথও লাভ হবে না। মোটকথা, আল্লাহ ও বান্দার পরিশোধযোগ্য সমস্ত হক পরিশোধ করা বা মাফ করানো তাওবার জন্য জরুরী। বিশেষ করে বান্দার হকের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারণ, তা পাওনাদার মাফ না করলে কোনভাবেই মাফ হতে পারে না। তাই আল্লাহপ্রাপ্তির পথে পা বাড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো পরিপূর্ণ তাওবা করা।

www.islamijindegi.com

তৃতীয় হেদায়াত
ইলমে দ্বীন অর্জন করা

দ্বিতীয় হেদায়াত মোতাবেক অতীতের গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে যখন ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ–নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবো। তাতে যত পরিশ্রম হোক, পার্থিব যত ক্ষতি হোক বা মানুষ তিরস্কার করুক না কেন, তা সহ্য করবো।

বলা বাহুল্য যে, এ কাজ দ্বীন সম্পর্কে জরুরী ইলম অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন পরিমাণ শরীয়তের বিধি–বিধান ও মাসআলা–মাসায়িলের ইলম অর্জন করা তার জন্য জরুরী হবে। চাই কিতাব পড়ে হোক বা আলেমদের থেকে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে হোক। আর কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে আরবী, ফার্সী, উর্দূ বা স্থানীয় যে কোন ভাষায় দ্বীনের জরুরী মাসআলা–মাসায়েল শিক্ষা করবে। এরজন্য সহজ উর্দূ ভাষায় লেখা সাইয়্যেদী হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) কর্তৃক রচিত 'বেহেশতী যেওর' এবং 'বেহেশতী গাওহার' কিতাব কোন আলেমের নিকট এক একটি সবক করে পড়বে বা নিজেই অধ্যয়ন করবে।

হযরতের লেখা 'সাফাইয়ে মুয়ামালাত', 'আদাবে মুয়াশারাত' পুস্তিকা এবং 'মিফতাহুল জান্নাত' কিতাবের তৃতীয় অধ্যায় পড়ে নিলে দ্বীন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন মাসআলার জন্য যথেষ্ট হবে। যে মাসআলা শিক্ষা করবে, তার উপর আমল করার দৃঢ় সংকল্পও করবে। যাতে করে রিপুর তাড়না ও মানুষের তিরস্কার আমলের ক্ষেত্রে বাধা না হয়।

www.islamijindegi.com

চতুর্থ হেদায়াত

পীরের প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিচয়

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এটাই নিয়ম। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে হয় না। কিন্তু বাতেনী আমলের ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ—যেগুলো তাসাওউফ ও তরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়—সেগুলোর ইলম হাসেল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক। এ সমস্ত বিষয়ের উস্তাদকে পরিভাষায় শাইখ, মুরশিদ বা পীর বলা হয়।

আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা সাধারণতঃ শাইখ ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য শাইখ ও মুরশিদের সন্ধান করা জরুরী। সন্ধান করে এ ধরনের শাইখ পেলে তার শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তার শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। দ্বিতীয় হেদায়াতে তাওবার যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে—কেউ যখন সে অনুপাতে আমল করতে আরম্ভ করবে—তখন সে বুঝবে যে, তাওবাকে সঠিক ও পরিপূর্ণ করতেও জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশিদের প্রয়োজন পড়ে। একজন কামেল শাইখের পথপ্রদর্শন ছাড়া তাওবা পরিপূর্ণ হওয়া জটিল ব্যাপার।

কামেল পীরের পরিচয় ঃ

যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিদ্যমান থাকবে, সেই কামেল পীর—

১. জরুরত পরিমাণ তার মধ্যে ইলমে দ্বীন থাকতে হবে।

২. তার আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র শরীয়তসম্মত হতে হবে।

৩. দুনিয়ার লোভ না থাকতে হবে। কামেল হওয়ার দাবী না করতে হবে। কারণ, এটিও দুনিয়ারই একটি দিক।

৪. কোন কামেল পীরের নিকট কিছুদিন থেকেছে।

www.islamijindegi.com

৫. সমকালীন ন্যায়পন্থী আলেম ও দরবেশগণ তাকে ভালো জানে।

৬. সাধারণ লোকের তুলনায় বিশেষ লোক অর্থাৎ, দ্বীনদার–সমঝদার লোকেরা তার অধিক ভক্ত।

৭. তার অধিকাংশ মুরীদ শরীয়তের পাবন্দী করে এবং তাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি লোভ নেই।

৮. সে আন্তরিকভাবে নিজের মুরীদদেরকে শিক্ষা দান করে এবং তাদের সংশোধন কামনা করে। মুরীদদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে ধড়–পাকড় করে। মুরীদদেরকে তাদের মর্জি মত ছেড়ে দেয় না।

৯. তার নিকট কিছুদিন বসার দ্বারা দুনিয়ার ভালোবাসায় স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভালোবাসায় বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়।

১০. সে নিজেও যিকির–শোগল করে। কারণ, আমল করার পাকাপোক্ত সংকল্প ছাড়া তা'লীমে ফায়দা হয় না।

যার মধ্যে উপরোক্ত আলামতসমূহ বিদ্যমান থাকবে, তার মধ্যে এগুলো তালাশ করবে না যে, তার দ্বারা কোন কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় কিনা। গোপন বা ভবিষ্যত এর বিষয় সে জানতে পারে কিনা। সে যে দু'আ করে তা কবুল হয় কিনা। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সে কিছু করে দেয় কিনা। কারণ, পীর বা ওলী হওয়ার জন্য এগুলো থাকা জরুরী নয়। এমনিভাবে এটাও দেখবে না যে, তার তাওয়াজ্জুহতে মানুষ ছটফট করে কিনা। কারণ, এসব বিষয় বুযুর্গ হওয়ার জন্য জরুরী নয়। মূলতঃ এ ধরনের প্রভাব নফসের সাথে সম্পৃক্ত, যা অনুশীলন করলে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি পরহেযগার নয়, এমনকি মুসলমানও নয়, সেও এগুলো করতে পারে। তাছাড়া তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার দ্বারা খুব বেশী লাভ হয় না। কারণ, তাওয়াজ্জুহের প্রভাব স্থায়ী হয় না। তাওয়াজ্জুহের এতটুকু ফায়দা রয়েছে যে, যে মুরীদের মধ্যে যিকিরের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না, তাকে পীর কিছুদিন তাওয়াজ্জুহ দিলে তার মধ্যে যিকিরের প্রভাব–প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। এমন নয় যে, অহেতুক লুটোপুটি খেতে থাকবে, ছটফট করতে থাকবে।

www.islamijindegi.com

পঞ্চম হেদায়াত

পীর-মুরীদীর উদ্দেশ্য

কামেল পীরের সন্ধান পাওয়ার পর তার হাতে মুরীদ হওয়ার পূর্বে তোমাকে মুরীদ হওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। কারণ, মুরীদ হওয়ার পিছনে মানুষের অনেক রকমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেউ তো চায় যে, আমি কারামতের অধিকারী হবো এবং কাশফের মাধ্যমে এমন অনেক বিষয় জানতে পারবো, যা অন্যদের জানা নেই। কিন্তু তুমি তৃতীয় হেদায়াতের মধ্যে এইমাত্র জেনে এসেছো যে, খোদ পীরের মধ্যেই কারামত থাকা বা তার কাশফের অধিকারী হওয়া—যার দ্বারা সে এমন সব জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবে, যা অন্যদের জানা নেই—জরুরী নয়, তাহলে মুরীদ বেচারা এর কী বা আকাংখা করবে?

কেউ এরূপ মনে করে যে, মুরীদ হওয়ার দ্বারা পীর সাহেব গুনাহ মাফের দায়িত্ব নিয়ে নিবে। যত পাপ কাজই করুক না কেন, কিয়ামতের দিন পীর তাকে দোযখে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। এটাও একান্তই ভুল ধারণা। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)কে বলেছেন—

يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ

'হে ফাতেমা! নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও।' অর্থাৎ, নেক আমল করো।

কেউ বোঝে যে, পীর সাহেব একনজরে আমাকে কামেল করে দিবে। আমাদের কোন পরিশ্রমও করতে হবে না বা গুনাহ ছাড়ার ইচ্ছাও করতে হবে না। এভাবেই যদি কাজ হয়ে যেতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের কিছুই করার প্রয়োজন হতো না। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে কামেল আর কে আছে? যদিও কারামত স্বরূপ কোথাও এরূপও হয়েছে যে, কোন বুযুর্গ একনজরে কাউকে কামিল করে দিয়েছেন। কিন্তু কারামত সবসময় হওয়া তো জরুরী নয়। বা সব আল্লাহর ওলী থেকে হওয়াও জরুরী নয়। তাই এ ভরসায় থাকা মারাত্মক ভুল।

www.islamijindegi.com

কেউ বলে যে, অনেক আবেগ, উদ্যম, উন্মত্ততা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হবে। হৈচৈ করবো। শ্লোগান দেবো। নিজে নিজে গুনাহ ছুটে যাবে। গুনাহ করার ইচ্ছাও থাকবে না। নেক কাজ করার জন্য ইচ্ছাও করতে হবে না, নিজে নিজেই সব নেক কাজ হয়ে যাবে। মনের কুমন্ত্রণা ও খটকা সব মিটে যাবে। মোটকথা, এক আত্মহারা অবস্থা বিরাজ করবে। এ চিন্তাটিকে পূর্বের চিন্তাসমূহের তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু এর কারণও অজ্ঞতা। এ সমস্ত অবস্থাকে 'কাইফিয়্যাত' ও 'হালাত' বলা হয়। কিন্তু 'হালাত' ও ভাবের সৃষ্টি হওয়া মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। তাছাড়া 'হালত' বা ভাবের উদয় হওয়া উত্তম হলেও, তা উদ্দেশ্য নয়। সে বস্তুই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হতে পারে, যা অর্জন করা মানুষের এখতিয়ারাধীন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা গেছে যে, এ ধরনের খাহেশের পিছনে নফসের কুমতলব নিহিত রয়েছে। আর তা হলো, নফস আরাম, মজা ও প্রসিদ্ধি চায়। যা এ সমস্ত ভাবের মধ্যে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষী হবে—এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা আসছে যে, আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা—এমন ব্যক্তির এ ধরনের খাহেশের সাথে কী সম্পর্ক? সে তো নিজের অবস্থা এমন বানাবে যে, তার অবস্থাই যেন বলে—

فراق و وصل چہ باشد رضاء دوست طلب
کہ حیف باشد از و غیر او تمنائے

অর্থ ঃ 'বিরহ আর মিলন সমান। আসল তো হলো তাঁর সন্তুষ্টি। আল্লাহর নিকট তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর প্রার্থনা করা আফসোসের ব্যাপার।'

روز ہا گر رفت گو رو باک نیست
تو بماں اے آنکہ جز تو پاک نیست

অর্থ ঃ 'ভাব ও উন্মাদনা চলে গেলে যাক। কোন আক্ষেপ নেই। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক অটুট থাকা চাই, যার মত অন্য কোন কিছু পবিত্র নয়।'

www.islamijindegi.com

بس زبون وسوسہ باشی دلا
گرطرب را باز دانی ازبلا

অর্থ ঃ 'হে মন! তুমি তো এখনও কুচিন্তাতেই মগ্ন রয়েছো। তুমি যদি আনন্দ ও বেদনার পার্থক্য বুঝতে!'

উপরন্তু এ ধরনের লোক দু' প্রকারের খারাবীতে লিপ্ত হয়ে থাকে। কারণ, এ সমস্ত ভাব ও হালত তার অর্জিত হয় অথবা হয় না। যদি অর্জিত হয়, তাহলে সে যেহেতু একেই বুযুর্গী মনে করে তাই সে নিজেকে কামিল মনে করতে আরম্ভ করে। সে এ সমস্ত হালত ও ভাবকে যথেষ্ট মনে করে প্রকৃত পরহেযগারী ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে গাফেল ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। নিজের জন্য ইবাদতের জরুরত বোধ করে না। বা কমপক্ষে ইবাদতকে মূল্যহীন মনে করতে থাকে। আর যদি এগুলো হাসেল না হয়, তাহলে এ দুঃখে সে নিঃশেষ হতে থাকে। আর এ অবস্থা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন ব্যক্তি এমন কিছু অর্জনের ইচ্ছা করবে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভূত, সেই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে আক্রান্ত হবে।

কেউ বলে যে, পীর সাহেবের নিকট বড় বড় আমল আছে, যা খুব কার্যকরী। যখন প্রয়োজন পড়বে তার থেকে তাবিজ-কবজ চেয়ে নিবো। বা পীর সাহেবের দু'আ খুব কবুল হয়। মামলা-মোকদ্দমায় ও অন্যান্য প্রয়োজনে তার দ্বারা দু'আ করাবো, ফলে সব কাজ আমার মর্জি মত হবে। যেন সমস্ত ক্ষমতা পীর সাহেবের হাতে রয়েছে। বা তার নিকট থেকে এমন কিছু শিখে নিবো, যার দ্বারা আমি বরকতের অধিকারী হয়ে যাবো। আমি ঝাড়-ফুঁক দিলে বা হাত দিয়ে শরীর মুছে দিলে অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে যাবে। এ ধরনের লোকেরা এ ধরনের আমল ও তার প্রভাবকেই বুযুর্গী মনে করে। এ সমস্ত আমলের বুযুর্গীর সাথে যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই, আর এ ধরনের নিয়ত যেহেতু একান্তই দুনিয়া কামনা, তাই এতে দ্বিগুণ ভ্রান্তি রয়েছে।

কেউ মনে করে যে, যিকির-শোগল করার দ্বারা আলো দেখা যাবে, বা গায়েবী আওয়াজ শোনা যাবে। এটাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও

www.islamijindegi.com

নির্বুদ্ধিতা। কারণ—

প্রথমত, যিকির ও শোগল দ্বারা আলো দেখা দেওয়া বা আওয়াজ শুনতে পাওয়া কোন জরুরী নয়। তাছাড়া এগুলো যিকির–শোগলের উদ্দেশ্যও নয়।

দ্বিতীয়ত, যিকির–শোগল করার দ্বারা যে আলো দেখা যায়, যে রং দেখা যায়, বা যে শব্দ শোনা যায়, কোন কোন সময় তা যিকিরকারীর মস্তিষ্কের প্রভাব হয়ে থাকে, গায়েবের বিষয় হয় না।

তৃতীয়ত, যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, গায়েবের বিষয় দেখতে পেয়েছে বা গায়েবের শব্দ শুনতে পেয়েছে, তাহলে তাতে কী লাভ হয়েছে? গায়েবের শব্দ শুনতে পাওয়ার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। আল্লাহর নৈকট্য তো তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা লাভ হয়। অনেক সময় শয়তান ফেরেশতার রূপে দেখা দেয়, অথচ প্রকৃত অর্থে সে ফেরেশতা নয় বরং শয়তানই হয়ে থাকে। তাছাড়া মৃত্যুর পর কাফেররা যে, গায়েবের অনেক কিছুই জানতে পারবে তা সবারই জানা কথা। যে জিনিস কাফেরদেরও লাভ হবে তা জানতে পারলে এমন কী কামেল হয়ে গেলো?

যখন একথা পরিস্কার জানা হয়ে গেলো যে, উপরে যত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনটিই লাভ করা পীর–মুরীদীর লক্ষ্য–উদ্দেশ্য নয়, তাই এ সমস্ত চিন্তা–ফিকির মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকেই পীর–মুরীদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করবে। যা লাভ করার উপায় হলো, আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুম পালন করবে এবং নিয়মিতভাবে যিকির করবে। পীর এ কথাই বলে থাকে আর মুরীদ সে অনুপাতেই আমল করে থাকে। যদিও এভাবে চলার দ্বারা তার ধারণা মত কোন ভাব–মত্ততা ও পূর্ণতা লাভ হলো না, কিন্তু আখেরাতে যিকির ও আল্লাহর আনুগত্যের ফায়দা অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি তার ঠিকই লাভ হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলার দীদার নসীব হবে। দোযখ থেকে রক্ষা পাবে।

www.islamijindegi.com

বাইয়াত ও পীর-মুরীদীর হাকীকত

পীর-মুরীদীর হাকীকতও এই যে, পীর মুরীদকে যিকির ও আল্লাহর হুকুম বলে দেওয়ার ওয়াদা করে, আর মুরীদ এ কথার স্বীকারোক্তি করে যে, পীর যা বলবে সে তা অবশ্যই পালন করবে। মুরীদ হওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও পীর তা'লীম দিতে এবং মুরীদ তার তা'লীম অনুপাতে আমল করতে পারে। তবে বিশেষ এ পদ্ধতিতে মুরীদ হওয়ার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও লাভ রয়েছে যে, এতে করে সেই মুরীদের প্রতি পীরের তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ অধিক হয়ে থাকে এবং মুরীদেরও পীরের কথা পালন করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব ও যত্ন হয়ে থাকে। বলা হয় যে, একজনকেই পীর ধরবে এবং নিজের পীরকে সমকালীন যুগের সকল বুযুর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, এর উপকারিতা শুধু এতটুকুই যে, এমতাবস্থায় উভয়ের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

বাকী রইলো, মুরীদ হওয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তি কাছে থাকলে পুরুষ হলে হাতের মধ্যে হাত দিয়ে বাইয়াত করা, আর স্ত্রীলোক হলে কাপড় ইত্যাদি ধরিয়ে বাইয়াত করা এটি পীর ও মুরীদের মধ্যে সংঘটিত স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় করার জন্য একটি ভালো পন্থা। তবে উভয়ের পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি এ পদ্ধতি ছাড়াও হতে পারে। এ কারণে যে ব্যক্তি দূর থেকে মুরীদ হতে চায়, তাকে হাতের মধ্যে হাত রাখা ছাড়াই মুরীদ করে নেওয়া হয়। অনেক হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, হাতের মধ্যে হাত দেওয়ার পদ্ধতিটি ভালো। সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাইয়াত করতেন, তখন মুরীদদের হাত নিজের পবিত্র হাত দ্বারা ধরে বাইয়াত করতেন। আর কাপড় বা এ জাতীয় কিছু ধরানো হাত ধরানোর পরিবর্তেই করা হয়।

www.islamijindegi.com

ষষ্ঠ হেদায়াত

মুরীদদের জন্য আমলপঞ্জি

চতুর্থ হেদায়াত অনুপাতে নিয়ত দুরুস্ত করে মুরীদ হওয়ার পর সুযোগ থাকলে কিছুদিন পীরের কাছে অবস্থান করবে, আর সুযোগ না হলে দূর থেকেই তার তা'লীম অনুযায়ী আমল করবে। এমনকি মুরীদ হওয়ার জন্যও যদি পীরের খেদমতে যেতে না পারে তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকেই পত্রযোগে বা বিশ্বস্ত কোন লোক মারফতে মুরীদ হতে পারে। পীরের কাছে গিয়েই মুরীদ হতে হবে এমনটি জরুরী নয়। মুরীদদেরকে তা'লীম দেওয়ার পদ্ধতি একেক পীরের একেক রকম হয়ে থাকে। তার সবগুলো এ কিতাবে লেখা জরুরী নয়। তাই ছোট একটি আমল বা ওযীফা লিখে দিচ্ছি। এ ওযীফাটি কলেবরে ছোট হলেও এর উপকারিতা এত বেশী যে, একে তাসাওউফের নির্যাস বলা যায়। সীমাহীন কষ্টের ফলেই এ ওযীফা লাভ হয়েছে। এ ওযীফা বর্ণনা করাই এ পুস্তিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর পথের যে কোন পথিক পীর ধরার আগ পর্যন্ত এবং আমার যে কোন মুরীদের সর্বদা আমল করার জন্য এ ওযীফা ও আমলপঞ্জী লিখে দিচ্ছি। আল্লাহর কাছে আমি জোরদার আশাবাদী যে, এ ওযীফা অনুপাতে আমলকারী ব্যক্তি মাহরূম থাকবে না। কোন ব্যক্তি এ ওযীফা মত আমল করতে থাকার পর তার পীর যদি এ ওযীফাই পছন্দ করে এবং এর অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তো ব্যাপার সহজ হয়ে গেলো। আর যদি পীর সাহেব এ ওযীফা ও আমলের মধ্যে কম-বেশী করে বা অন্য কোন ওযীফা বলে দেয় তাহলে পীর সাহেব যেমন বলবে তেমনি আমল করবে। তবে এ আমলপঞ্জীর শুরুতে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে তাতে কম-বেশী হতে পারবে না, সেগুলো একইরূপ থাকবে।

এতে বর্ণিত 'দস্তুরুল আমল' বা আমলপঞ্জীর সারকথা হলো, আল্লাহর পথের পথিক হয় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ, অনালেম হবে অথবা আলেম হবে। এদের প্রত্যেকে আবার আয়-রোজগার এবং বিবি-বাচ্চার হক আদায়ের ফিকিরে ব্যস্ত থাকবে বা এগুলো থেকে বে-ফিকির ও

www.islamijindegi.com

নিশ্চিন্ত থাকবে। তাই আল্লাহর পথের পথিকদের মোট চার শ্রেণী হলো–

এক. সেই সাধারণ লোক, যে আয়-রোজগার ও বউ-বাচ্চার হক আদায় করা থেকে বেফিকির বা নিশ্চিন্ত।

দুই. সেই সাধারণ লোক, যে আয়-রোজগার এবং বউ-বাচ্চার হক আদায়ের ফিকিরে ব্যস্ত।

তিন. সেই আলেম, যে দুনিয়াবী কাজ থেকে মুক্ত।

চার. সেই আলেম, যে আয়-রোজগারের কাজে ব্যস্ত। এ চার শ্রেণীর প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফা রয়েছে।

দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা ঃ

সর্বপ্রথম নিজের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করবে। জরুরী জরুরী মাসআলাসমূহ শিক্ষা করবে। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ঐ সমস্ত মাসআলার উপর আমল করবে। যখনই নতুন কোন মাসআলার প্রয়োজন পড়বে, কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। আর তার পীর আলেম হলে তিনিই সর্বোত্তম। যাকিছু প্রয়োজন পড়বে তার নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। সম্ভব হলে শেষ রাতেই তাহাজ্জুদ পড়বে। তা নাহলে ইশার নামাযের পরে বেতের নামাযের পূর্বে কিছু নফল নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সময় না থাকলে যে সমস্ত নামাযের পর অবসর আছে ঐ সমস্ত নামাযের পর একশ' বার 'সুবহানাল্লাহ', একশ' বার 'আলহামদু লিল্লাহ', একশ' বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', একশ' বার আল্লাহু আকবার' এবং ঘুমানোর পূর্বে একশ' বার 'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি' পাঠ করবে। উঠতে-বসতে সর্বদা দুরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে। এতে ওযু থাকা বা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পুরা করা জরুরী নয়। ওযু ও বিনা ওযু সর্বাবস্থায় দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। তবে সব সময় তাসবীহ হাতে নিয়ে ঘুরবে না।[১]

১. অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে তাসবীহ হাতে নিয়ে ঘুরবে না। তবে যদি তাসবীহ হাতে না রাখলে যিকির করার কথা মনে না থাকে তাহলে তাসবীহ রাখায় কোন দোষ নেই।

www.islamijindegi.com

কুরআন শরীফ পড়া জানা থাকলে প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফও তিলাওয়াত করবে। এ কিতাবের শেষাংশে পুরুষ ও নারীদের জন্য যে নসীহত লেখা হয়েছে, সেগুলো মাঝে মাঝে পাঠ করবে এবং সে অনুপাতে আমল করবে। কখনো কখনো নিজের পীরের নিকট বা অন্য কোন এমন বুযুর্গের নিকট—যিনি পরহেযগার ব্যক্তি এবং তার আকীদা–বিশ্বাস সহীহ—বসবে। তবে পীরের নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু হাদীয়া নিয়েই যেতে হবে, এমন পাবন্দী করবে না। এ লৌকিকতা নিখাদ ভালোবাসার পরিপন্থী।

এর বাইরে যে সময় বাঁচবে তা পরিবার–পরিজনের জন্য হালাল রুজির সন্ধানে লেগে থাকবে। বাল–বাচ্চার জন্য উপার্জন করাও ইবাদত। আর লোকটি যদি সাধারণ মহিলা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সময় ঘরের কাজ করা, বিশেষ করে স্বামীর খেদমত করা তার জন্য ইবাদত। তাই সে এ কাজে রত থাকবে। তবে কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া পীরের নিকট যাবে না। যেসব দিনে ঋতুস্রাব হয়, সে সব দিনেও ওযীফার সময় ওযু করে ওযীফা পাঠ করবে। তবে কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। কারণ, এমতাবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত নয়।

দুনিয়াবী কাজ থেকে মুক্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা ঃ

এ ব্যক্তির ওযীফাও তাই, যা পূর্বের জনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তার ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয় অধিক হবে—

(ক) সম্ভব হলে পীরের নিকট গিয়ে পড়ে থাকবে। তবে নিজের পানাহারের ব্যবস্থা এমনভাবে করবে, যেন অন্য কারো উপর এর চাপ না পড়ে। পানাহারের কোন যাহেরী সামানা না হলে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই থাকা জরুরী যে, অন্যের উপর ভরসা করে থাকবে না। হয় কোন মজদুরী করবে, আর সে সাহস নাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকবে। কিছু পেলে খাবে, না পেলে সবর করবে।

(খ) আর যদি পীরের নিকট থাকতে না পারে, তাহলে নিজের বাড়ীতে থাকবে, চাই ঘরে হোক, চাই কোন মসজিদে হোক। তবে যতদূর সম্ভব মানুষদের থেকে দূরে থাকবে। কারো নিকট বেশী আসা–যাওয়া

www.islamijindegi.com

করবে না। দ্বীন বা দুনিয়ার কোন কাজ না থাকলে কারো সাথে মেলামেশা করবে না। কোন প্রয়োজনে কারো সঙ্গে মিশতে হলে জিহ্বার প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন কথা, যেমন—কারো অসাক্ষাতে তার দোষচর্চা করা বা এ জাতীয় কোন কথা যেন মুখ থেকে বের হতে না পারে।

(গ) জামাআতের সাথে নামায আদায় করবে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় কাজ এবং বিশ্রামের পর যেটুকু সময় বাঁচবে, সে সময় নির্জনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে, মুনাজাতে মকবুল পড়বে বা নফল নামায, দুরূদ শরীফ বা ইস্তিগফার পড়বে।

(ঙ) আর যদি পড়াশোনা জানা থাকে তাহলে কিছু সময় উর্দু, ফার্সী (বা বাংলা) ভাষায় লেখা দ্বীনী কিতাবসমূহও কোন আলেমকে দেখিয়ে নির্বাচন করে পড়বে। যেখানে বুঝে না আসবে, সেখানে নিজের বুঝ–বুদ্ধিমতো অর্থ না বানিয়ে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে।

(চ) ঐ এলাকার কোথাও কোন তালিবে ইলম বা যিকিরকারী থাকলে তাদের খেদমত করার কাজে নিজের সময়ের বড় একটি অংশ ব্যয় করবে। এতে অন্তরে নূর পয়দা হয় এবং অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হয় না।

(ছ) মাঝে মাঝে নফল রোযাও রাখবে।

এ দুই শ্রেণীর অনালেম মানুষকে এর অতিরিক্ত কোন যিকির–শোগল দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এর মধ্যে অনেক অস্বাভাবিক বিষয় দেখা দেয়, যার ফলে খারাপ পরিণতির ভয় আছে। যেগুলো আলেম ছাড়া অন্য মানুষ সহ্য করতে পারবে না। তবে মুরীদের মধ্যে আগ্রহ দেখলে এবং তাকে যোগ্য মনে করলে নির্জনে বসে তিন হাজার থেকে ছয় হাজার বার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করতে বলবে। তবে সশব্দে এবং মাথা দুলিয়ে নয়, বরং নীরবে করতে বলবে। এর অধিক কোন যিকির অনালেম ব্যক্তির জন্য মোনাসেব নয়। বাকী অন্যান্য ওযীফা এবং নফল নামায যত মন চায় পড়বে। তবে অনালেম ব্যক্তি যদি আলেমদের সুহবতে থাকার ফলে আলেমদের মত সমঝদার হয়ে থাকে, তাহলে সে আলিমদের মত বলে গণ্য হবে। তাকে যিকির–শোগল দেওয়ায় ক্ষতি নেই।

www.islamijindegi.com

দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত আলেম ব্যক্তির ওযীফা

(ক) অবসর সময়ে যখন মন চিন্তামুক্ত থাকে এবং পেট বেশী ভরাও না এবং বেশী ক্ষুধা কাতরও না, এমন সময় নির্ধারণ করে নির্জনে বসে ওযুর সাথে হালকা আওয়াজে কিছুটা 'জরবের' (ধাক্কার) সাথে যিকিরের প্রতি মন লাগিয়ে বার হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পর্যন্ত যত বার সম্ভব 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে।

(খ) পাবন্দীর সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে।

(গ) দিনের যে কোন সময়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং 'কুরুবাতুন ইনদাল্লাহি ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল, (আরবী মুনাজাতে মকবুল)এর এক মঞ্জিল নিয়মিত পড়বে।

(ঘ) মাদরাসার মুদাররিস হলে তো ভালো, তা নাহলে কিছু সময় তালিবে ইলমদেরকে পড়ানোর কাজে অবশ্যই ব্যয় করবে।

(ঙ) প্রয়োজন হলে বা শ্রোতারা আগ্রহ প্রকাশ করলে ওয়ায করে জরুরী মাসআলা–মাসায়েল বয়ান করবে। তবে ওয়াযের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না। এমন প্রয়োজনীয় কথা—যা শুনলে সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়—তা অস্পষ্টভাবে এবং কঠোর ভাষায় বলবে না, বরং পরিস্কার ভাষায় নম্রভাবে বলবে।

(চ) ওয়ায করে বিনিময় নিবে না।

(ছ) সাধারণ লোকদেরকে কড়া বা কর্কশ কথা বলবে না। এতে অনর্থক শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

(জ) 'ইহইয়াউল উলূম' ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করবে।

(ঝ) নিজের পীর থেকে দূরে অবস্থান করে যিকির–শোগল করবে না। তবে পীরের নিকট অবস্থান করে কিছুদিন যিকির–শোগল করে থাকলে এবং পীর সাহেব এখনও তা করার কথা বলে থাকলে কোন অসুবিধা নেই।

অবসর আলিম ব্যক্তির ওযীফা

(ক) অবসর কাল অল্পদিনের হলেও, যার ন্যূনতম মেয়াদ ছয়

www.islamijindegi.com

মাস—কিছুদিন নিজের পীরের কাছে অবস্থান করে যিকির করবে। এ শ্রেণীর আলেমের জন্য এতটুকু ওযীফাই যথেষ্ট যে, তাহাজ্জুদ নামাযের পর বারো তাসবীহ, অর্থাৎ, দুইশ' বার 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ', চারশ' বার 'ইল্লাল্লাহ', ছয়শ' বার 'আল্লাহু আল্লাহ'—প্রথম আল্লাহ শব্দের শেষে 'পেশ' এবং দ্বিতীয়টির শেষে 'জযম' দিয়ে যিকির করবে এবং শুধু 'আল্লাহ' একশ' বার। এই মোট তের তাসবীহ হলো। কিন্তু এটি বারো তাসবীহ নামে পরিচিত। এই বারো তাসবীহ সামান্য আওয়ায ও 'যরব' বা ধাক্কার সাথে আদায় করবে। কিন্তু ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সশব্দে যিকির করা এবং 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোতে কোন সওয়াব নেই, বরং এতে সওয়াব হবে বলে বিশ্বাস করা বিদআত।

হাদীস শরীফের এ নিষেধাজ্ঞা—

اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

অর্থাৎ, 'তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করো, কারণ, তোমরা তো কোন বধির বা দূরবর্তী কাউকে ডাকছো না।'

আমার মতে ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন সওয়াবের বিশ্বাস নিয়ে সশব্দে যিকির করবে। আর কোন কোন আলেম এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, এত চিৎকার করে যিকির করবে না, যার দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়। যেমন, ঘুমন্ত লোকদের কষ্ট হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যে জোরে যিকির করতে নিষেধ করেছেন, তার কারণও উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহই। তা নাহলে জোরে যিকির করা জায়েয।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় নামায শেষ হওয়ার আলামত এই ছিলো যে, মানুষ সশব্দে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠতো। এমনিভাবে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বেতের নামাযের পর 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলার সময় আওয়াজ উঁচু করার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এভাবে জোরে যিকির করার ফায়দা এই যে, এতে করে অন্য চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা কম আসে। কারণ, এর ফলে যিকিরের আওয়ায কানে আসে, যে কারণে মন সহজে সেদিকে ধাবিত থাকতে পারে। আর এ ফায়দা অল্প আওয়াযে যিকির করার দ্বারাও লাভ হয়।

www.islamijindegi.com

একইভাবে 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোর মধ্যেও কোন সওয়াব নেই। এর মধ্যেও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান মতে একটি ফায়দা রয়েছে। তা হলো, শক্ত ধাক্কার ফলে মনে তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপের ফলে মন নরম হয়। মন নরম হলে যিকিরে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের চিন্তা এবং আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত পয়দা হয়। আল্লাহর আনুগত্যের চিন্তা এবং আল্লাহর মুহাব্বত এ দু'টি জিনিস ইসলামে লক্ষ্য ও কাংখিত বস্তু। তাই 'যরব' বা ধাক্কা দেওয়া শরীয়তে উদ্দেশ্য বস্তু নয়, তবে উপরোক্ত দুই উদ্দীষ্ট বস্তু এর দ্বারা লাভ হয় বিধায় এটি উপায় ও মাধ্যমের পর্যায়ের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। তবে অধিক জোরে 'যরব' লাগানোর ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই মধ্যম পর্যায়ে 'যবর' লাগাবে, এর অধিক নয়।

আরেকটি বোঝার বিষয় হলো, তাসাওউফের কিতাবসমূহের মধ্যে যিকির করার সময় মাথা ডানে–বামে ঝুকানোর কথা লিখেছে। এ ব্যাপারে জানা উচিত যে, পূর্বের যুগের লোকেরা শক্তিশালী ছিলো এবং তাদের মস্তিষ্ক সবল ছিলো, ফলে তারা এ ঝাকুনি সহ্য করতে পারতে। বরং শক্তিশালী হওয়ার ফলে এরূপ ঝাকুনি ছাড়া তাদের মধ্যে যিকিরের আছর বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো না। যার ফলে সজোরে 'যরব' লাগানোর উদ্দেশ্যে মাথা ডান দিকে নিয়ে 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোর তাদের প্রয়োজন পড়তো। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা দুর্বল। সাধারণ 'যরবেই' তাদের অন্তরে আছর পয়দা হয়। তাই বর্তমানে এমন করবে না। অন্যথায় মাথা খারাপ হওয়ার ভয় আছে। এ যুগের লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'লা–ইলাহা' বলতে সারা শরীর ধীরে ধীরে ডান দিকে একটু ঝুকিয়ে দিবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় বাম দিকে নিয়ে আসবে। শরীরকে এতটুকু পরিমাণ নাড়ানোর উদ্দেশ্যও হলো, এক অবস্থায় যিকির করতে একঘেয়েমি লাগে, পক্ষান্তরে শরীর নাড়ানোর ফলে কিছুটা আরামবোধ হয়। তা নাহলে এতটুকুরও প্রয়োজন ছিলো না। উপরন্তু 'যরব' লাগানোর সময় মাথা ঝাকুনি দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'যরব' লাগানোর সময় 'ইল্লা'–এর 'হামযা'

www.islamijindegi.com

উচ্চারণকালে একটু চাপ দিয়ে উচ্চারণ করবে। 'হামযা' উচ্চারণের স্থান থেকে সীনা নিকটবর্তী হওয়ার ফলে 'হামযা' উচ্চারণ করতে চাপ দিলে সীনা পর্যন্ত তার প্রভাব পড়বে। একইভাবে অন্যান্য যিকিরের সময়েও এ নিয়মেই 'যরব' লাগাবে। আর শরীর ঝাকানো এরচেয়ে কম হলেও চলবে। এ সমস্ত বিবরণ ছিলো বারো তাসবীহ সংক্রান্ত। বারো তাসবীহের যিকির করার পর ঘুমের চাপ থাকলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিবে। আর ঘুম না আসলে ইচ্ছা হলে ঐ বারো তাসবীহ যিকিরের মধ্য থেকে কোন একটি যিকির আরো অধিক পরিমাণে করবে, আর ইচ্ছা হলে কর্মমুক্ত থাকবে।

(খ) ফজর নামাযের পর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে এবং মুনাজাতে মকবুল এক মঞ্জিল পড়বে।

(গ) তারপর নির্জনে বসে বারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার বার পর্যন্ত যতবার সম্ভব অল্প আওয়াজে মধ্যম পর্যায়ের 'যরব' বা ধাক্কাসহ 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে। (প্রত্যেক আল্লাহ শব্দের শেষে 'জযম' হবে)। দুপুরে কিছু সময় ঘুমিয়ে নিবে।

(ঘ) যোহর নামাযের পর আসর নামায পর্যন্ত বারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার বার সহজে যত বার সম্ভব হয় পূর্বের নিয়মে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে।

(ঙ) আসর নামাযের পর পীর সাহেবের কোন কাজ না থাকলে তার কাছে বসে থাকবে। আর পীর সাহেব কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে বা সেখানে উপস্থিত না থাকলে বা মনে পীর সাহেবের নিকট বসার বিশেষ আগ্রহ না থাকলে মাঠ, জঙ্গল, বাগান বা নদীর দিকে ঘুরতে বের হবে। পীর সাহেব উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি নিয়ে যাবে। ঘুরতে বের হয়ে সাধারণ মুসলমানদের কবর এবং আল্লাহর ওলীদের মাযারও যিয়ারত করবে।

(চ) মাগরিব নামাযের পর এক ঘন্টা/আধ ঘন্টা যতক্ষণ মনোযোগ থাকে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী হিসাব-কিতাব ইত্যাদি যা যা হবে, সেগুলোর 'মোরাকাবা' করবে।

www.islamijindegi.com

মৃত্যুর মোরাকাবা

মৃত্যুর মোরাকাবা করার পদ্ধতি এই যে, নির্জনে বসে মৃত্যুর পর যা যা ঘটবে, সেগুলো স্মরণ করবে এবং মনে করবে যে, এখনই এসব কিছু আমার উপর দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে।

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করার ফলে আল্লাহর মুহাব্বত এবং মৃত্যুর মোরাকাবার ফলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। আল্লাহর এই মুহাব্বত এবং দুনিয়ার প্রতি এই ঘৃণাই তার সফলতার জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

(ছ) এর বাইরে যে সময় বাঁচবে, তার মধ্যে উঠতে–বসতে, চলতে–ফিরতে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে, বা অন্য যে কোন যিকির ভালো লাগবে, সেই যিকির করতে থাকবে।

প্রসিদ্ধ 'পাছে আনফাস'–এর অর্থ ও উদ্দেশ্যও এই যে, কোন মুহূর্ত যেন আল্লাহর ইয়াদ থেকে খালি না যায়। এই ইয়াদ যে কোন যিকিরের মাধ্যমেই হতে পারে। 'পাছে আনফাস'–এর যে পদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে, সুনির্দিষ্টভাবে সে পদ্ধতিতেই তা হতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। বরং তার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটিও একটি পদ্ধতি।

এভাবে যিকির করতে করতে যদি নিজের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হতে দেখে এবং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, মনে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেক কম হতে থাকে এবং যিকিরে মন বসতে থাকে তাহলে আমার মতে 'শোগল' করার জরুরত নেই।[১]

সদা–সর্বদা পরহেযগারীর প্রতি যত্নবান থাকা এবং নিয়মিত উপরে বর্ণিত 'মুরাকাবা' করতে থাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে। সারাজীবন এটিই করতে থাকবে। আখেরাতে তো এর ফল নিশ্চিত পাবেই—এবং ফল পাওয়ার আসল ওয়াদা তো আখেরাতেই—তবে আল্লাহ তাআলার মঞ্জুর হলে দুনিয়াতেও তার অন্তরে অপূর্ব ও অবাককর ইলম ও মারেফাত এবং নতুন নতুন ভাব ও কাইফিয়্যাত জন্ম নিবে। কখনো আবেগ–উদ্দীপনা, কখনো প্রেম–প্রীতি এবং কখনো ভয়–ভীতির কাইফিয়্যাত ও ভাবের উদয়

১. সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'শোগল' এমন সব তাদবীর বা ব্যবস্থাকে বলে, যেগুলো গ্রহণ করলে সাধারণত একাগ্রতা ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

www.islamijindegi.com

হবে। শরীয়তের বিধি–বিধানের রহস্যাবলী উদঘাটিত হবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার আচরণ এবং তার প্রতি আল্লাহর আচরণ সঠিক হবে। তার দ্বারা এমন কোন কাজ ঘটলে—যার জন্য তাকে সতর্ক করা প্রয়োজন—সে বিষয়ে সতর্ক করা হবে। এবং সেও বুঝতে পারবে যে, এ কাজটি আমার দ্বারা সঠিকভাবে পালন হয়নি। এ সবের মধ্যে যে স্বাদ রয়েছে, তার সামনে বিশ্বজগতের রাজত্বও মূল্যহীন। এ সমস্ত অবস্থাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় 'হালাত' বলা হয়।

প্রত্যেকের 'হালাত' ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যেহেতু নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই তার সবগুলো লিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এমন অবস্থা দেখা দিলে পীর সাহেবের নিকট আসা জরুরী। তিনি এ সমস্ত হালাতের হাকীকত বা মর্ম বলতে সক্ষম। 'হালাতের' ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে মুরীদের যিকির–শোগলের মধ্যে পীর সাহেব যথোচিত পরিবর্তন করেন। পীরের নিকট অবস্থান করায় আরো যে সমস্ত ফায়দা রয়েছে, সেগুলো এই হেদায়াতের শেষে বর্ণনা করা হবে। এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়াকে 'কাশফে ইলাহী' বলা হয়। 'কাশফে কাউনী' (অর্থাৎ, গোপন বিষয় জানতে পারা এবং ভবিষ্যতের ব্যাপার প্রকাশ পাওয়া) স্বাদের দিক থেকেও 'কাশফে ইলাহী'র সমান নয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক থেকেও সমান নয়।

মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন 'কাশফে ইলাহী'র মধ্যে বড়, আর খিযির আলাইহিস সালাম ছিলেন 'কাশফে কাউনী'র মধ্যে বড়। এ দু'জনের মধ্যে কার মর্যাদা বড়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মূসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা যখন বড় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে হযরত খিযির আলাইহিস সালামের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হযরত খিযির আলাইহিস সালামের নিকট পাঠানোর দ্বারা এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো যে, কথা বলার সময় নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় কোন কথা বলে ফেলবে না। বরং চিন্তা–ভাবনা করে কথা বলবে। কারণ, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, বর্তমান সময়ে দ্বীনের

www.islamijindegi.com

সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বলেছিলেন—'সবচেয়ে বড় আলেম আমি'।

তাঁর এ কথা এদিক থেকে ঠিক ছিলো যে, যে ইলম জরুরী, তা সবচেয়ে বেশী আমি জানি। কিন্তু তিনি কথাটি এমন বলেছিলেন, যার দ্বারা শ্রোতা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারতো যে, সব ধরনের ইলম জানার দাবী তিনি করছেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে, 'কাশফে কাউনীর' মধ্যে খিযির আলাইহিস সালাম তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। যদিও তাঁর এ 'কাশফ' মর্যাদার দিক থেকে 'কাশফে ইলাহী'র সমকক্ষ নয়। তবুও সাধারণভাবে এ কথা বলা তো ভুল প্রমাণিত হলো যে, 'আমি সবচেয়ে বেশী জানি।' তাই উত্তরে একথা বলা দরকার ছিলো যে, 'কাশফে কাউনীর' মধ্যে আমি সর্বাধিক জ্ঞানী নই। যার 'কাশফে ইলাহী' হয়, তাকে যদি পীর–মুরীদীর কাজ এবং মানুষের আত্মার সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তাকে 'কুতবুল ইরশাদ' বলে। আর যার 'কাশফে কাউনী' হয়, তাকে যদি মানুষের দুনিয়ার কাজের খেদমত ন্যস্ত করা হয়, তবে তাকে 'কুতবুত তাকবীন' বলে।

এর বাইরে যে সময় বাঁচবে তাতে মন লাগিয়ে মুখে উচ্চারণ করে কোন–না–কোন যিকির করতে থাকবে। চাইলে দুরূদ শরীফ পড়বে—আর আমার মতে এটাই সর্বোত্তম—চাইলে ইস্তিগফার পড়বে, চাইলে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়বে, চাইলে অন্য যে কোন যিকির করবে। মোটকথা, যাতে মন লাগবে তাই পড়তে থাকবে। এ সময়গুলোতে শুধু মনে মনে যিকির করবে না, বরং মুখেও উচ্চারণ করতে থাকবে। কারণ, অনেক সময় এতে ধোঁকার সৃষ্টি হয়, অন্তরে যে, আল্লাহর স্মরণ নাই সেদিকে খেয়াল থাকে না। আরো মারাত্মক হলো, কখনো এরূপ ধোঁকা হয়ে থাকে যে, আল্লাহকে ভুলে গিয়ে এরূপ মনে করে থাকে যে, আমি আল্লাহর স্মরণে ডুবে গিয়ে 'আত্মহারা' হয়ে গেছি।

(জ) দু'টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকার প্রতি সর্বদা যত্নশীল হবে। প্রথমত, কোন মুহূর্তে যেন আল্লাহর ইয়াদ দিল থেকে দূর হতে না পারে। যার উপায় হলো, সর্বদা যিকির করতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, খুব সতর্কতার সাথে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গুনাহ

www.islamijindegi.com

থেকে বেঁচে থাকবে। মন, মুখ, হাত, পা, চোখ, কান মোটকথা সর্বাঙ্গের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর ইয়াদ না থাকার কারণে যেমন দিলের নূর চলে যায়, তেমনিভাবে গুনাহের কারণেও দিলের নূর চলে যায় এবং আল্লাহর সাথের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যা অতি বড় ক্ষতির কারণ। ঘটনাচক্রে অসতর্কতার ফলে বা নফসের প্ররোচনায় কোন গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কাকুতি-মিনতী করে তাওবা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কৃত গুনাহের জন্য মাফ চাবে। কিছু কিছু গুনাহের কারণে এ পথের সবিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে। সেগুলো হলো—

এক. 'রিয়া'—অর্থাৎ, মানুষকে দেখানোর নিয়তে কোন আমল করা।

দুই. 'তাকাব্বুর'—অর্থাৎ, নিজেকে বড় মনে করা। মানুষের মধ্যে যখন তাকাব্বুর ও অহংকার থাকে তখন এর কারণে দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণ ও পূর্ণতা নিয়ে সে গর্ব করে, কখনো অহমিকায় লিপ্ত হয়।

তিন. কারো গীবত-শেকায়েত করা, কাউকে তিরস্কার করা, কারো উপর আপত্তি করা। বরং অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলার কারণেও দিলের নূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ কারণেই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য মানুষদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা করা উচিত নয়।

চার. নামাহরাম কোন নারী বা বালকের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো বা মনে মনে তার কল্পনা করা।

পাঁচ. অন্যায়ভাবে বা সীমাতিরিক্ত রাগ করা, বা কারো সঙ্গে কর্কশ ও কঠোরভাবে কথা বলা।

একইভাবে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ারও কিছু কিছু ধরন অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আর তাহলো, পার্থিব বিভিন্ন সম্পৃক্ততার কারণে যে খোদা-বিস্মৃতির সৃষ্টি হয়। এ বিস্মৃতি যিকির করার দ্বারাও দূর হয় না। যখন যিকিরে লিপ্ত হবে বার বার সে দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট হবে।

এ 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফার একটি জরুরী বিষয় এই যে, এ ওযীফা মত যিকিরকারী ব্যক্তির যে পর্যন্ত কিছুটা শক্তভাবে 'নিসবতে বাতেনী' লাভ না হবে (যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে) সে পর্যন্ত মানুষের

www.islamijindegi.com

যাহেরী বা বাতেনী কোনপ্রকার খেদমতে লিপ্ত হবে না। যেমন, ছাত্রদেরকে পড়ানো, জনসাধারণকে ওয়ায শোনানো, রোগীদের চিকিৎসা করা, তাবীয-কবজ লেখা, পীর-মুরীদী করা এগুলোর কিছুই করবে না। একদম এক কোণায় চুপচাপ পড়ে থাকবে। তবে এগুলোর কোন একটি করতে একান্ত বাধ্য হলে সে ভিন্ন কথা।

বাতেনী নিসবত

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার আলামত দু'টি—

প্রথম এই যে, আল্লাহর ইয়াদ অন্তরে এমনভাবে জমে বসবে যে, কখনই তা অন্তর থেকে দূর হবে না। আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য অধিক চিন্তা-চেষ্টা করার প্রয়োজন পড়বে না।

দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তাআলার সকল বিধি-বিধান—চাই তা আল্লাহর ইবাদত সংক্রান্ত হোক, মানুষের সঙ্গে লেনদেন ও মুআমালাত সংক্রান্ত হোক, উত্তম স্বভাব-চরিত্র সংক্রান্ত হোক বা কথাবার্তা, চালচলন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত হোক, সর্ববিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানমত চলার প্রতি এমন আগ্রহ জন্মাবে এবং একইভাবে যেসব কাজ তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলোর প্রতি এমন ঘৃণা জন্মাবে, যেমন আগ্রহ মনের প্রিয় বস্তু এবং যেমন ঘৃণা মনের অপ্রিয় বস্তুর প্রতি হয়ে থাকে। মন থেকে দুনিয়ার যাবতীয় মোহ ও লালসা বের হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত কর্মকাণ্ড কুরআনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক হবে। তবে সহজাত অলসতা যদি কোন হুকুম বাস্তবায়নে বাধা হয়, বা মনে কোন কুমন্ত্রণা জাগে, কিন্তু সে অনুপাতে যদি আমল না করে তাহলে এরূপ মনে করবে না যে, শরীয়তের হুকুম পালনের আগ্রহ এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মায়নি। আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও এ অবস্থানই কাঙ্ক্ষিত। আমি যাকে 'বাতেনী নিসবতের' আলামত বলে উল্লেখ করলাম, তাকে 'মুহাব্বতে ইলাহী' বা আল্লাহর ভালোবাসা বলে।

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার সাথে সাথে যদি গায়েব থেকে কোন ইলম বা ভেদের কথাও তার অন্তরে উদয় হতে থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিকে 'আরেফ' বলা হয়।

www.islamijindegi.com

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার পর পড়ানো, ওয়ায করা, কিতাব লেখায় কোন ক্ষতি নেই, বরং ইলমে দ্বীনের খেদমত করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর পীর সাহেব যদি তাকে মুরীদ করার এবং যিকির–শোগল শেখানোর অনুমতিও দেন তাহলে আল্লাহর বান্দাদেরকে এ ফায়দা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু নিজেকে বড় মনে করবে না। নিজেকে মানুষের খাদেম ভাববে। আর পীর সাহেব এর অনুমতি না দিলে কখনোই এরূপ দুঃসাহস করবে না এবং নিজের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রার্থনাও করবে না। কারণ, এটি মূলতঃ বড়ত্বের প্রার্থনা ও আকাঙ্খা। আর প্রার্থনা করার দ্বারা পীর যদি অনুমতি দেয়ও সে অনুমতি কোন কাজের নয় বরং বড় হওয়ার চেয়ে ছোট থাকা অনেক ভালো। তবে পীর সাহেব হুকুম দেওয়ার পর তার হুকুম না মানাও সমীচীন নয়। যদি সবাই এরূপই করতো তাহলে পীর–মুরীদীর ধারাবাহিকতাই বন্ধ হয়ে যেতো। মুরীদদের থেকে কখনোই মালের আশা করবে না। যদি তারা কিছু নজরানা দেয়ও, তবে তা মুরীদ হওয়ার সময় কখনই গ্রহণ করবে না। কারণ, এটি দৃশ্যত বিনিময় নেওয়ার মত হলো। আর অন্য সময় খুশী হয়ে হালাল উপার্জন থেকে নিজের আয়ের পরিমাণ অনুপাতে যদি এতটুকু দেয়, যার দ্বারা তার পেরেশানী হবে না, তাহলে এমতাবস্থায় হাদীয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীয়া গ্রহণ না করায় মুসলমানের দিল ভাঙ্গা হয় এবং আল্লাহর নাশোকরী করা হয়। যদিও হাদীয়ার পরিমাণ কমই হোক না কেন। এমনকি অন্যদের সামনে দিলেও নিতে লজ্জাবোধ করবে না। কারণ, এও অহংকারের কারণেই হয়ে থাকে।

এখানে এসে 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফার বিবরণ শেষ হলো। এ ওযীফার আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কারণ, এতে আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলা হয়েছে। আর বিস্তারিত না বললে তাদের শান্তি ও স্বাদ লাভ হয় না। অন্যথায় সারকথা অল্পই। সারকথাটি এখন পুনরায় এ কারণে লিখে দিচ্ছি যে, এ লম্বা আলোচনার মধ্যে মূল আলোচনার অংশটি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মূল ওযীফার তালিকা এই—

ক. তাহাজ্জুদ নামায।

www.islamijindegi.com

খ. তাহাজ্জুদ নামাযের পর 'বার তাসবীহ'।

গ. ফজর নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত এবং এক মঞ্জিল মুনাজাতে মকবুল।

ঘ. তারপর ১২ হাজার থেকে ২৪ হাজার বার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির।

ঙ. আসর নামাযের পর পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকা বা খোলা মাঠ, বন ইত্যাদিতে ঘোরাফেরা করা এবং আল্লাহর ওলীদের কবর যিয়ারত করা।

চ. মাগরিব নামাযের পর মৃত্যুর মোরাকাবা বা ধ্যান করা।

ছ. এর বাইরে যে সময় বাঁচবে, তখন অগণিতভাবে দুরূদ শরীফ পড়া।

জ. প্রয়োজন হলে 'শুগলে আনহদ' করা।

ঝ. পরহেজগারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

ঞ. পাবন্দীর সাথে যিকির করা।

ট. গুনাহ ও আল্লাহ বিস্মৃতি থেকে বেঁচে থাকা।

বিশেষ করে এ সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচা—

১. মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করা।

২. নিজেকে বড় মনে করা।

৩. গর্ব করা।

৪. নিজের মনে মনে নিজের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য খুশি হওয়া ও আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হওয়া।

৫. কারো অসাক্ষাতে তার দোষ চর্চা করা।

৬. অনর্থক কথা বলা ও মানুষের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করা।

৭. নামাহরাম নারী ও বালকদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো, বা মনে মনে খাহেশাতের সাথে তাদের কল্পনা করা।

৮. বেশী রাগ করা।

৯. একগুঁয়েমী করা।

১০. দুনিয়াবী সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

www.islamijindegi.com

ঠ. 'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়া পর্যন্ত ওয়ায করা, ছাত্র পড়ানো ইত্যাদি কাজ পরিহার করা।

ড. পীর সাহেবের অনুমতি ছাড়া মুরীদ না বানানো এবং যিকির-শোগল না শিক্ষা দেওয়া।

এসবগুলোর মূলকথা হলো, দু'টি—

১. আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মতো চলা।

২. নিয়মিতভাবে যিকির করা।

গুনাহের দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে ফাটল সৃষ্টি হয়, আর যিকিরের কমতির দ্বারা আল্লাহর ইয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আল্লাহর আনুগত্য, নিয়মিত যিকির করা, গুনাহ থেকে বেঁচে চলা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়াকে নিজের আসল কাজ মনে করবে। যদি কিছুদিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে এ কাজগুলো করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ মাহরূম বা বঞ্চিত হবে না।

এগুলোর উপর আমল করার ফায়দা যদিও শুরু থেকেই হতে আরম্ভ করে, কিন্তু প্রথম প্রথম তা বুঝে আসে না, তবে এমন এক সময় আসবে, যখন সে নিজেও বুঝতে পারবে, কিন্তু ঘাবড়াবে না, তাড়াহুড়া করবে না, অলসতাও করবে না। কারণ, ফায়দা পাওয়ার কোন মেয়াদ নির্ধারিত নাই। কেউ তার দায়িত্বও নিতে পারে না। তবে এ আশা করতে পারে—

اندریں راہ می‌خراش و می‌تراش ☆ تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دمے آخر بود ☆ کہ عنایت باتو صاحب سر بود

অর্থ ঃ 'এ পথের পথিককে আমৃত্যু চেষ্টায় লেগে থাকতে হবে। মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য বেফিকির হওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত কোন না কোন সময় এমন আসবে, যখন আল্লাহর মেহেরবানী লাভ হবে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সফলতা লাভ হবে।'

এ সমস্ত আমল ও ওযীফার সাথে সাথে প্রথম দিকে কিছু বেশী এবং তারপর মাঝে মাঝে যদি পীর সাহেবের খেদমতে থাকার সুযোগ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা—'নূরুন আলা নূর'। পীর সাহেবের নিকট

www.islamijindegi.com

অবস্থান করার বহুবিধ ফায়িদার মধ্যে একটি ফায়দা এই যে, পীর সাহেবকে দেখে দেখে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী নিজের মধ্যে নিয়ে আসবে। যিকির ও ইবাদতের মধ্যে প্রাণ ও সজীবতা সঞ্চার হবে। সাহস বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত নতুন 'হালাত' দেখা দিবে, সে সবের ব্যাপারে পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ হবে। এগুলো ছাড়া আরো অনেক ফায়দা আছে, যেগুলো পীর সাহেবের নিকট অবস্থান করলে আপনা আপনি লাভ করবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোগী ডাক্তারের নিকটে অবস্থান করা আর দূরে অবস্থান করার মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। জনৈক কবি বড় চমৎকার বলেছেন—

مقام امن و مئے بےغش و رفیق شفیق ☆ گرت مدام میسر شود زہے توفیق

অর্থ ঃ নিরাপদ ও প্রশান্তিময় জায়গা, আল্লাহর মুহাব্বতের নির্ভেজাল শরাব আর স্নেহশীল পীরের সুহবত যদি সদা-সর্বদার জন্য লাভ হয়, তাহলে তা আল্লাহ তাআলার বড় দয়া।

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

'আল্লাহ সত্য বলেন, আর তিনিই পথ দেখান।'

www.islamijindegi.com

সপ্তম হেদায়াত

মনের একাগ্রতা সৃষ্টির বর্ণনা

যিকিরকারী ব্যক্তির এমন সব কাজ ও কথা থেকে দূরে থাকা উচিত, যার দ্বারা মন পেরেশান ও বিক্ষিপ্ত হয়। কারণ, মনের প্রশান্তি ও স্থীরতা অনেক বড় দৌলত। মনের একাগ্রতা নষ্টকারী অনেক বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে কিছু এই—

এক. নিজের অসতর্কতার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ করা। তাই শারীরিক সুস্থতার খুব হেফাযত করবে। মস্তিষ্ককে সজীব রাখার এবং মনকে শক্তিশালী করার ফিকির করবে। এজন্য ঔষধ এবং খাদ্য উভয়টি ব্যবহার করবে। খাদ্য এত কম গ্রহণ করবে না যে, শরীর দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে যায়। আবার এত বেশীও খাবে না যে, বদ হজম হয়। কারণ, এতেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

বেশী স্ত্রী সহবাস করবে না। এতেও দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ বিশেষত মন ও মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায়। তাই তীব্র চাহিদা সৃষ্টি না হলে স্ত্রী সহবাস করবে না।

সত্যিকার অর্থে ক্ষুধা না লাগলে আহার করবে না। আর কিছুটা চাহিদা অবশিষ্ট থাকতে আহার করা বন্ধ করে দিবে।

ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মধ্যম পর্যায়ে ঘুমাবে। এতো বেশী ঘুমাবে না যে, অলস হয়ে পড়ে। আবার এতো কমও ঘুমাবে না যে, শুষ্ক হয়ে যায়।

দুই. বিনা প্রয়োজনে উন্নত খাবারের চিন্তায় লিপ্ত হওয়াও মনকে পেরেশান করে।

তিন. মনকে পেরেশান করার তৃতীয় কারণ সাজসজ্জায় লিপ্ত থাকা। এ ব্যাপারে কবি বলেছেন—

عاقبت سازد ترا ازدیں بری ☆ ایں تن آرائی و ایں تن پروری

অর্থ ঃ এত সাজসজ্জা আর পেট পালার চিন্তার পরিণতিতে দ্বীন বিদায় নিবে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ দ্বীনদারী থাকবে না।

তবে একেবারে অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকাও খারাপ। কারণ,

www.islamijindegi.com

এর ফলেও দিল ময়লা হয়। সাদামাটাভাবে পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন থাকবে। তবে চিন্তা–ভাবনা ছাড়া যদি ভালো খাবার ও ভালো পোশাক পাওয়া যায় এবং এর ফলে নফসের মধ্যে কোন মন্দ চরিত্র সৃষ্টি হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে এটিকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করবে এবং শোকর আদায় করবে।

চার. চতুর্থ বিষয় সম্পদের লোভ এবং সম্পদ সঞ্চয়ের চিন্তায় পড়া বা নিজের নিকট যে সম্পদ আছে তা অনর্থক খরচ করে শেষ করা। এতদুভয় কারণেই দিল পেরেশান হয়। লোভী মানুষ তো সর্বদা এ চিন্তায়ই লেগে থাকবে, আর অমিতব্যয়ী ব্যক্তি সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরিণতিতে পেরেশানীতে লিপ্ত হবে, বা অন্যের মালের প্রতি তাকিয়ে থাকবে।

পাঁচ. পঞ্চম বিষয় কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতায় জড়ানো। বন্ধু তাকে ঘিরে ধরে তার সময় নষ্ট করবে। আর শত্রু তাকে কষ্ট দিয়ে পেরেশানীতে ফেলবে।

এভাবে আরো যে সমস্ত বিষয় পেরেশানীর কারণ হয়, অথচ তা জরুরী নয়, সেগুলো থেকে যতদূর সম্ভব খুব দূরে থাকবে। তবে পেরেশানীর কাজ না করা সত্ত্বেও যদি কোন পেরেশানী দেখা দেয়, বা শরয়ী প্রয়োজনে কাজ করার ফলে পেরেশানী দেখা দেয়—যেমন, কোন সুদখোর ব্যক্তি তাকে কিছু দিলে সে তা নিতে অস্বীকার করলো, ফলে ঐ ব্যক্তি তার শত্রু হয়ে গেলো—তাহলে এ ধরনের পেরেশানীতে তার আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি হবে না। এ ধরনের পেরেশানীতে পড়লে অস্থির হবে না। আল্লাহ তাআলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখবে, তিনি তার সাহায্য করবেন। এমনকি এমতাবস্থায় কষ্টে আক্রান্ত হলেও এর মধ্যে আল্লাহর হিকমত আছে মনে করে তার উপর রাজি থাকবে। এতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি আরো অধিক লাভ হবে।

www.islamijindegi.com

অষ্টম হেদায়াত

এখতিয়ারী ও গায়রে এখতিয়ারী আমলের বর্ণনা

যে সমস্ত বিষয় এখতিয়ারভুক্ত, সেগুলো করতে ত্রুটি করবে না। আর যেগুলো এখতিয়ারভুক্ত নয়—সেগুলো যদি ভালো হয়, তাহলে সেগুলো অর্জনের পিছনে পড়বে না। আর যদি সেগুলো অবাঞ্ছিত হয়, তাহলে সেগুলো দূর করার ফিকিরে পড়বে না। যেমন, নামায, কুরআন তেলাওয়াত বা যিকিরের মধ্যে জোর করে হলেও মনোযোগ ঠিক রাখা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। এ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ ঠিক রাখার কয়েকটি পদ্ধতি আছে—

এক. উদাহরণ স্বরূপ একটি তরীকা এই যে, ইবাদতের সময় আল্লাহ তাআলার সত্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে।

দুই. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, শব্দের অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে, বা শুধু শব্দের দিকে ধ্যান রাখবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শব্দ মনোযোগ সহকারে উচ্চারণ করবে। যাহোক, যে কোন পদ্ধতিতে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার ব্যাপারে ত্রুটি করবে না। তবে নামাযে বা কুরআন তেলাওয়াতে মন না বসা বা মজা না লাগা বা বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা বা কুচিন্তা অধিকহারে উদয় হওয়া—তা যত খারাপই হোক না কেন—মানুষের এখতিয়ারের বাইরে। তাই এজন্য চিন্তা করবে না। শুধু নিজের এখতিয়ারভুক্ত কাজ করে যাবে। এভাবে কাজ করতে থাকার বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ সমস্ত চিন্তা আপনাআপনি কমে যায়। বিশেষ করে ওয়াসওয়াসার প্রতি তো মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। ওয়াসওয়াসা আসার কারণে ব্যথিতও হবে না। এতে বরং ওয়াসওয়াসা আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে চরম পেরেশানীতে পড়তে হয়। এর উত্তম সমাধান এই যে, নিজের যিকির ইত্যাদির দিকে নতুন করে মনোযোগ দিবে। ওয়াসওয়াসার দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। ফলে তা নিজে নিজেই চলে যাবে।

আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত, তাই আল্লাহর হুকুম পালনে অলসতা করবে না। কিন্তু ভালো স্বপ্ন দেখা, দু'আ কবুল হওয়া, যিকিরের প্রভাবে ছটফট করতে

www.islamijindegi.com

থাকা, অনিচ্ছাকৃত কান্না আসতে থাকা ইত্যাদি লাভ হওয়ার ফিকির করবে না, কারণ এসব বিষয় মানুষের এখতিয়ারাধীন নয়।

একইভাবে গুনাহ করা তো মানুষের এখতিয়ারাধীন। তাই তার কাছেও যাবে না। কিন্তু এসব বিষয় এখতিয়ারাধীন নয়, তাই এগুলোর ফিকিরে পড়বে না। যেমন, মন্দ স্বপ্ন দেখা, মন প্রফুল্ল ও সতেজ না থাকা, আয়-রোজগার কমে যাওয়া, যিকির করার সময় কোন জিনিস দেখতে না পাওয়া, বা যিকিরের কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পারা, অসুস্থতা, ইত্যাদি কারণে পেরেশান হবে না।

আরেকটি উদাহরণ হলো, অনিচ্ছায় কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যাওয়া এখতিয়ারাধীন নয়। এতে কোন গুনাহ বা ক্ষতিও নাই, যদিও এতে কষ্ট হয়ে থাকে। তবে নিম্নের কাজগুলো মানুষের এখতিয়ারভুক্ত— যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে তাকে দেখা, তার সাথে কথা বলা, তার কথা শোনা, তার নিকট আসা-যাওয়া করা, মনে মনে তার কল্পনা করা, তার কথা চিন্তা করে মনে মনে স্বাদ উপভোগ করা—তাই এগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। আর অনেক সময় এগুলো থেকে বেঁচে চলার ফলে সেই প্রেমও লোপ পায়। কিন্তু এগুলোতে ত্রুটি করলে গুনাহগার হবে এবং মন কালিমাযুক্ত হবে।

একইভাবে কোন গুনাহের দিকে মন ধাবিত হওয়া মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত, তাই তা দূর করার চিন্তায় পড়বে না। তবে ঐ গুনাহের কাজ করা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত, তাই তা থেকে দূরে থাকবে। মনের ঐ চাহিদার উপর আমল করবে না।

যে ব্যক্তি এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয় লাভ করার বা তা দূর করার ফিকিরে লিপ্ত থাকে, তার সারাটি জীবন পেরেশানীতে কাটে। এমনকি অনেক লোক এসব কারণেই নিজেকে মরদুদ ও বিতাড়িত ভেবেছে। এমনকি এ কারণে কেউ কেউ তো আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। আর অনেকে ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকার ছেড়ে দিয়ে নির্দ্বিধায় গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। মোটকথা, তারা ঈমানের ক্ষতি করেছে বা ঈমানের সাথে সাথে জানেরও ক্ষতি করেছে। কারণ, আত্মহত্যা করার ফলে প্রাণও হারিয়েছে এবং গুনাহগারও হয়েছে। এর ফলে জান ও

www.islamijindegi.com

ঈমান উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যিকির ও ইবাদত ছাড়ার কারণে এবং গুনাহ করার কারণে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং গুনাহগার হয়েছে। যা ঈমানের ক্ষতি। আসল কথা হলো, এখতিয়ার বহির্ভূত যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো এমন, যেগুলো মনের কাংখিত বস্তু, সেগুলো লাভ হওয়া কখনো কখনো আল্লাহর পথের পথিকের জন্য মন্দ পরিণতির কারণও হয়ে থাকে। যেমন নিজেকে কামেল মনে করতে আরম্ভ করে। ফলে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম ভাবতে থাকে। বা নিজেকে কামেল দাবী করতে আরম্ভ করে বা এর ফলে বুযুর্গ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফলে তার ক্ষতি হয়। অপরদিকে এগুলো লাভ না হওয়া তার উপকারিতার কারণ হয়। যেমন নিজেকে অযোগ্য ও তুচ্ছ মনে করে।

আর এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলো হওয়া মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। অথচ সেগুলো হওয়া অনেক সময় তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে। যেমন তা সহ্য করতে কষ্ট হয়, যা এক প্রকারের মুজাহাদা। সংকীর্ণতা হয়, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হয়, যার দ্বারা দিল পরিষ্কার হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্র প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

عَسَىٰٓ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَىٰٓ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.

অর্থাৎ, 'অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, একটি জিনিস হওয়া তোমরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করো, কিন্তু বাস্তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর অনেক সময় তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করো, কিন্তু বাস্তবে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর হয়ে থাকে।'

(সূরা বাকারা-২১৬)

তবে পছন্দনীয় জিনিস যদি নিজের থেকেই লাভ হয়, তাহলে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে শোকর আদায় করবে। আর এ সমস্ত জিনিস অর্জিত না হওয়াকে উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ মত নেয়ামত মনে করে শোকর আদায় করবে। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

www.islamijindegi.com

নবম হেদায়াত

পীরদের বিভিন্ন প্রথার বর্ণনা

বর্তমানে অধিকাংশ পীরের মধ্যে কিছু কিছু প্রথা প্রচলিত হয়ে আছে। তার মধ্যে কিছু প্রথা তো সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বিরোধী। যেমন, কবরের চতুর্দিকে ঘোরা। কবরকে চুম্বন করা। কবরের উপর চাদর দেওয়া। বুযুর্গদের নামে মান্নত করা। তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা।

আর কিছু প্রথা আসলে জায়েয ছিলো, কিন্তু সেগুলোর সাথে বিভিন্ন নাজায়েয বিষয় মিলিত হওয়ার ফলে সেগুলোও নাজায়েয হয়ে গেছে। যেমন, ওরস করা, কাওয়ালী শোনা, খতম পড়া, বা মিলাদের মাহফিল করা—সাধারণ মানুষ এগুলো থেকে নিষেধ করাকে বা নিজে এগুলো না করাকে বুযুর্গীর পরিপন্থী মনে করে। এ সমস্ত প্রথা ও রুসুমের মধ্যে যে সমস্ত খারাপ দিক রয়েছে, সেগুলো আমি অধম বিস্তারিতভাবে 'ইসলাহুর রুসুম', 'হক্কুস সিমা', 'তালীমুদ্দীন' এর পঞ্চমখণ্ড এবং 'হিফযুল ঈমান' কিতাবে লিখে দিয়েছি।

আর কিছু বিষয় রয়েছে এমন, যেগুলোকে বুযুর্গীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে করলে এবং এগুলোকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও উপায় মনে করলে তা জঘন্য বিদআত বলে গণ্য হবে। আর যদি এ ধরনের কোন ভুল বিশ্বাস বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, তবে তা নিছক দুনিয়াবী কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন বিভিন্ন আমল-শোগল করা বা হালাল পশুর গোশত না খাওয়া।

আর কিছু প্রথা রয়েছে এমন, যেগুলো ভুল বিশ্বাসযুক্ত না হলে ভালো বলে গণ্য হবে। যেমন, 'শাজারা' পাঠ করা। কারণ, তার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওয়াসেতায় দু'আ করা হয়। যা জায়িয হওয়া বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু 'শাজারা' পাঠ করে যদি এরূপ মনে করা হয় যে, 'শাজারায়' উল্লেখিত ব্যক্তিদের নাম পাঠ করার দ্বারা এ লাভ হবে যে, তারা আমাদের 'হালাতের' প্রতি 'তাওয়াজ্জুহ' দিবেন। তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সূত্রহীন ভ্রান্ত আকীদা। যার নিষেধাজ্ঞা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত—

www.islamijindegi.com

وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার উপর আমল করো না।'

(সূরা বানী ইসরাঈল–৩৬)

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তাসাওউফের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা। তবে কেউ যদি এমন আলেম হন, যিনি 'মা'কুলী ইলম' যেমন 'মানতিক' ইত্যাদি এবং 'মানকুলী ইলম' অর্থাৎ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি ভালো করে অবগত এবং তিনি এমন বুযুর্গদের সুহবতে থেকেছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে ভালোভাবে অবগত—তিনি এ ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করলে ক্ষতি নেই। আর এমন ব্যক্তি না হলে তার জন্য এ ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করা দ্বীন–ঈমান ধ্বংসকারী। তাই তারা এ ধরনের কিতাব মোটেও দেখবে না। যেমন, মাওলানা রূমী (রহঃ)এর 'মসনবী', 'দিওয়ানে হাফেয' বা অন্যান্য বুযুর্গের মালফূয—বাণী—অর্থাৎ, যে সমস্ত কথা তারা বর্ণনা করেছেন এবং মুরীদরা সেগুলো সংকলন করে কিতাব বানিয়েছেন। যদি তাদের এ সমস্ত চিঠি ও বাণীর সংকলনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভেদ–কথা বা যে সমস্ত 'কাইফিয়্যাত' বা আধ্যাত্মিক অবস্থা ঐ সমস্ত বুযুর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো—সেগুলোর বর্ণনা থাকে তাহলে সেগুলো পড়বে না। বরং যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে ঐ সমস্ত বুযুর্গের ঘটনাবলী রয়েছে, সেগুলোও পড়বে না। এ সমস্ত কিতাব সাধারণ লোকদের বুঝে আসবে না।

কিছু কিছু পুরুষ বা নারী মুরীদ হয়েও নিজের অভ্যাস ও অবস্থার সংশোধন করে না। তাই তাদের ব্যাপারেও কিছু জরুরী কথা লিখে দিচ্ছি। বাকী বিস্তারিত মাসআলার পরিপূর্ণ বর্ণনা দ্বীনের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে রয়েছে।

www.islamijindegi.com

দশম হেদায়াত

সাধারণ লোকদের (যারা আলেম নয়) উদ্দেশ্যে নসীহত

১. আলিমদের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা রাখো।

২. তাদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে থাকো।

৩. লেখাপড়া জানা থাকলে বেহেশতী যেওর এবং বেহেশতী গওহার বা তদস্থলে 'সাফাইয়ে মুয়ামালাত' এবং 'মিফতাহুল জান্নাত' কিতাব দেখে দেখে সে অনুপাতে আমল করতে থাকো।

৪. শরীয়তের খেলাফ পোশাক পরিধান করো না। যেমন, গিরার নীচে পায়জামা পরা, কোট–প্যান্ট পরা, রেশমের কাপড় পরা, যরদ (হলুদ) রংয়ের কাপড় পরা, চার আঙ্গুলের চেয়ে চওড়া খাঁটি সোনালী কাজ করা টুপি বা জুতা পরা।

৫. দাড়ি কাটিও না বা চাঁছিও না। তবে এক মুষ্টির অতিরিক্তটুকু ইচ্ছা হলে কাটতে পারো, ইচ্ছা হলে রাখতে পারো।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের তরীকার খেলাফ যত রুসম–রেওয়াজ চালু আছে সব পরিহার করো। সে সমস্ত রুসম–রেওয়াজ দুনিয়ার রংয়ে হোক, আর দ্বীনের রংয়ে হোক, যেমন, মীলাদ, ফাতেহাখানী, ওরশ, বিবাহ–শাদীতে গায়ে হলুদ, বরযাত্রা ও মেহমানদারীর জন্য বা নাম ফুটানোর জন্য খাবার পাকানো এবং খাওয়ানো বা নামের জন্য কিছু দেওয়া ও দেওয়ানো, আকীকা, খাতনা এবং বিসমিল্লাহ করানোর জন্য মানুষদের একত্রিত হওয়া, এ সবকিছু পরিত্যাগ করো। এ সমস্ত অনুষ্ঠান নিজের বাড়ীতেও করবে না এবং অন্যদের বাড়ীতে হলে তাতে শরীক হবে না। কেউ মারা গেলে তিন দিন, দশ দিন বা চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান করা, শবে বরাতের হালুয়া বা মুহাররমের শোক মিছিল ও তাজিয়া মিছিল নিজেও করবে না এবং অন্যদের নিকট গিয়ে এ সমস্ত কাজে শরীকও হবে না। মেলা বা এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যাবে না এবং সন্তানদেরকেও যেতে দিবে না। তাদেরকে এ জাতীয় বেহুদা কাজের জন্য পয়সাও দিবে না। যেমন, ঘুড়ি, পটকা বা ছবিওয়ালা খেলনা ক্রয় করা।

৭. গীবত ও গালাগালি থেকে মুখকে হেফাযত করো।

www.islamijindegi.com

৮. জামাআতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ো।

৯. কোন নারী বা বালকের দিকে কুনজরে তাকিও না।

১০. গান–বাদ্য শুনো না।

১১. সব কাজের জন্য পীরের কাছে তাবীজ–কবজ চেয়ো না। বরং তার নিকট থেকে দ্বীনের কথা শিক্ষা করো। তবে বিভিন্ন কাজের জন্য দু'আ করানোতে ক্ষতি নেই।

১২. এরূপ ভেবো না যে, নজরানা দেওয়ার মত কিছু নাই, তাই পীরের কাছে কীভাবে যাবো।

১৩. এরূপ মনে করো না যে, পীর সাহেব সব কিছুর খবর রাখেন, তার কাছে কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

১৪. আধ্যাত্মিকতার কিতাব পড়ো না এবং এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করো না।

১৫. তাকদীরের বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।

১৬. পীরের কথা মত আমল করো।

১৭. সুদ–ঘুষ নিয়ো না। বন্ধকের আয়ও সুদ, তা থেকে দূরে থাকো। শরীয়তবিরোধী সব ধরনের লেনদেন থেকে বেঁচে চলো।

১৮. মাসআলা জিজ্ঞাসা না করে স্বপ্নের কথা মত আমল করো না।

১৯. পীর সাহেবের নিকট গিয়ে তাকে কোন কাজে মগ্ন দেখলে তার কাজে বিঘ্ন ঘটাবো না। এমন জায়গাতেও বসো না, যার ফলে তোমাকে দেখে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বরং এক কোণায় বসে পড়ো। তিনি কাজ থেকে অবসর হলে তার সম্মুখে যাও।

২০. 'তা'লীমুল মাতালিব', 'তা'লীমুদ্দীন' (প্রথম চার খণ্ড) এবং 'জাযাউল আ'মাল' সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করো।

সাধারণ নারীদের জন্য উপদেশ

১. শিরকের কাছেও যেয়ো না।

২. সন্তান হওয়ার জন্য বা সন্তান জীবিত থাকার জন্য মন্ত্রতন্ত্র ও যাদু–টোনা করো না।

৩. শুভ–অশুভ লক্ষণ দেখিও না।

www.islamijindegi.com

৪. ওলী–বুযুর্গদের নামে নযর–নিয়ায করো না।

৫. বুযুর্গদের নামে মান্নত করো না।

৬. শবে বরাত, মুহাররম, আরাফা ইত্যাদিতে হালুয়া–রুটি বা তাবাররুকের রুটি বানিও না।

৭. নিজের দেবর, ভাসুর, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভগ্নিপতি, ননদ–জামাই, ধর্মভাই, ধর্মবাপ মোটকথা যাদের সাথে পর্দা করার বিধান শরীয়ত দিয়েছে—সে যদি পীরও হয় এবং নিকটাত্মীয়ও হয়—তাদের সাথে গুরুত্ব সহকারে পর্দা করবে।

৮. শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরিধান করো না। অর্থাৎ, যার মধ্যে পেট, পিঠ, বাহু ইত্যাদি খোলা থাকে বা এমন পাতলা কাপড়, যার মধ্যে দেহের রং বা মাথার চুল ফুটে ওঠে। লম্বা হাতাওয়ালা, দীর্ঘ, মোটা কাপড়ের জামা বানাও। এমন মোটা কাপড়েরই ওড়না বানাও। মাথার কাপড় যেন সরে না যায়, সে ব্যাপারে সাবধান থাকো। তবে ঘরে শুধু মহিলা মানুষ থাকলে বা নিজের মা–বাপ, আপন ভাই ইত্যাদি ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে তখন মাথার কাপড় সরে গেলে সমস্যা নেই।

৯. কাউকে উঁকি দিয়ে দেখো না।

১০. বিবাহ–শাদী, বরযাত্রা, গায়ে হলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ও দাওয়াতে নিজেও যাবে না এবং নিজেদের এখানেও কাউকে আনবে না।

১১. সুখ্যাতির জন্য কোন কাজ করো না।

১২. অভিশাপ দেওয়া, খোঁটা দেওয়া এবং গীবত করা থেকে নিজের মুখকে হেফাযত করো।

১৩. পাঁচওয়াক্ত নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়ো। ধীরস্থিরভাবে মন লাগিয়ে নামায পড়ো। রুকু–সিজদা ভালোভাবে আদায় করো। ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলে এক ওয়াক্ত নামাযও যেন বাদ না যায়, সেদিকে খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখো।

১৪. তোমার নিকট সোনা–রূপার অলংকার বা সোনা–রূপার কাজ করা জিনিস থাকলে হিসাব করে যাকাত দাও।

১৫. বেহেশতী যেওর নামক কিতাবটি নিজে পড়ো বা কারো দ্বারা পড়িয়ে শোনো এবং সে অনুপাতে আমল করো।

www.islamijindegi.com

১৬. স্বামীর কথা মেনে চলো।

১৭. স্বামীর সম্পদ তার অলক্ষ্যে ব্যয় করো না।

১৮. কখনোই গান শুনো না।

১৯. কুরআন পড়া শিখে থাকলে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করো।

২০. কোন কিতাব পড়ার জন্য বা দেখার জন্য কিনতে হলে আগে কোন আলেমকে দেখিয়ে নাও, তিনি যদি কিতাবটি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বলেন, তাহলে খরিদ করো, নইলে করো না।

২১. যেখানে বিভিন্ন প্রথার মিষ্টান্ন বিতরণ হয়, সেখানে যেয়ো না এবং বিতরণের কাজে অংশও নিও না।

যিকির-শোগলকারীদের জন্য বিশেষ উপদেশ

১. উপরোক্ত নসীহতগুলো দেখে সে অনুপাতে আমল করো।

২. সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করো, এতে অন্তরে অনেক নূর পয়দা হয়।

৩. কেউ তোমার মতের পরিপন্থী কোন কাজ করলে ধৈর্য ধারণ করো। তাড়াতাড়ি কিছু বলা-কওয়া করতে যেয়ো না। বিশেষ করে রাগের অবস্থায় খুব সামলিয়ে চলো।

৪. কখনোই নিজেকে কামেল মনে করো না।

৫. কোন কথা বলার আগে চিন্তা করে দেখো, যদি তার মধ্যে কোন খারাপ দিক না থাকে বরং দ্বীন বা দুনিয়ার জরুরত বা ফায়দা থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হও, তখন মুখ দিয়ে সে কথা বলো।

৬. কোন খারাপ লোকেরও দোষচর্চা করো না বা শুনো না।

৭. শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন কোন দরবেশ ব্যক্তির উপর দরবেশীর কোন হালত প্রবল হওয়ার ফলে যদি এমন কোন কথা বলে, যা তোমার মতে শরীয়তবিরোধী—তাকে তুমি তিরস্কার করো না।

৮. নিম্নশ্রেণীর কোন মুসলমানকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না।

৯. ধনসম্পদের লোভ-লালসা করো না।

www.islamijindegi.com

১০. তাবীয–কবজের কাজে লিপ্ত হয়ো না। কারণ, এর ফলে সব সময় সাধারণ মানুষ ঘিরে রাখে।

১১. যত বেশী সম্ভব যিকিরকারীদের সঙ্গে অবস্থান করো। এর ফলে দিলে নূর, সাহস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১২. দুনিয়ার ঝামেলা বেশী বাড়াইও না। অপ্রয়োজনে ও অনর্থক মানুষের সাথে বেশী মিশো না। আর প্রয়োজনে কখনো মিশলে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। কাজ হয়ে গেলে তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বিশেষ করে পরিচিত লোকদের থেকে খুব দূরে থাকবে। হয় আল্লাহওয়ালাদের সুহবত তালাশ করো, না হয় এমন সাধারণ লোকদের সাথে মেশো, যাদের সাথে জানাশোনা নেই। কারণ, এ ধরনের লোকের সাথে মিশলে ক্ষতি কম হয়।

১৩. তোমার অন্তরে কোন 'কাইফিয়াত' বা বিশেষ অবস্থা পয়দা হলে বা কোন আশ্চর্য ইলম উদয় হলে নিজের পীরকে অবগত করো।

১৪. পীরের নিকট বিশেষ কোন 'শোগলের' দরখাস্ত করো না।

১৫. যিকির করার ফলে অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা নিজের পীরকে ছাড়া অন্য কাউকে বলো না।

১৬. তাসাওউফের কিতাব দেখার আগ্রহ হলে প্রথমে 'তা'লীমুদ্দীন' (পঞ্চম হিস্‌সা) এবং 'কালীদে মসনবী' দেখো। তবে শর্ত হলো, তোমার 'মা'কুলী' এবং 'মানকুলী' ইলম খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে।

১৭. কথা ঘুরায়ো (পেচাবে) না। বরং ভুল বুঝতে পারলে সাথে সাথে ভুল স্বীকার করে নাও।

১৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। তাঁর কাছেই তোমার সব অভাবের কথা বলো। দ্বীনের উপর কায়েম থাকার জন্য তাঁর নিকট দরখাস্ত করো।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি গ্রন্থ

মুমতায লাইব্রেরী
মননশীল ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশক
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, আণ্ডার গ্রাউণ্ড
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamijindegi.com